গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়

CENTRAL LIBRARY

অমরকানন, বাঁকুড়া

বাৎসরিক কলেজ পত্রিকা

বলাকা

২০২২

ডেঙ্গু একটি মশা বাহিত রোগ
মশারি ব্যবহার করুন
সাবধান থাকুন।
মশারি বিতরণ কর্মসূচী
গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়
N.S.S. Unit - I & II
অমরকানন, বাঁকুড়া

MAHAVIDYALAYA
LLY REGARDING
PANDEMIC"
NSS UNIT I & II

OBINDA PRASAD MAHAVIDYALAYA
ARKANAN
BANKURA
ESTD- 1985
DEPARTMENT OF SPORTS

গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়

বাৎসরিক কলেজ পত্রিকা

বলাকা

২০২২

অমরকানন ✯ বাঁকুড়া

শোকবার্তা

নয়নসম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছে যে ঠাঁই

বিশ্বজিৎ কুন্ডু (অধ্যাপক গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়)
আবির কুমার সিংহ (প্রাক্তন, করণিক গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়)
শোকাহত –গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়ের পরিবার বর্গ

গভীর দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানানো যাচ্ছে যে,বিগত দিনে আমরা যে সমস্ত স্মরণীয় ব্যাক্তিত্বকে হারিয়েছি তাদের জন্য গভীরভাবে শোকাহত এবং মর্মাহত। আমরা তাঁদের বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি রইল গভীর সমবেদনা।

১. লতা মঙ্গেশকর (সঙ্গীত শিল্পী)
২. বাপী লাহিড়ী (সঙ্গীত শিল্পী)
৩. সাধন পান্ডে (রাজ্যের মন্ত্রী)
৪. বিপিন রাওয়াত (সেনা প্রমুখ)
৫ . শাঁওলি মিত্র (সাহিত্যিক নাট্যকার)
৬. সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় (সঙ্গীত শিল্পী)
৭. নারায়ন দেবনাথ (কমিক চরিত্র স্রষ্টা)
৮. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (অভিনেতা)
৯. অভিষেক চট্টোপাধ্যায় (অভিনেতা)
১০. বুদ্ধদেব গুহ (সাহিত্যিক)
১১. সুভাষ ভৌমিক (জাতীয় ফুটবল খেলোয়াড়)
১২. দিলীপ কুমার (অভিনেতা)
১৩. বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত (সাহিত্যিক)
১৪. শঙ্খ ঘোষ (সাহিত্যিক)
১৫. বিরজু মহারাজ (কথক শিল্পী)
১৬. সুরজিৎ সেনগুপ্ত (বিশিষ্ট ফুটবল ক্রিড়াবিদ)
১৭. পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ (বাচিক শিল্পী)
১৮. পন্ডিত শিবকুমার শর্মা (সন্তুর বাদক)

এবং করোনা মহামারীতে মৃত পৃথিবীর অসংখ্য ব্যক্তিবর্গ

Members of the Governing body

1. Shri Hridaymadhab Dubey	President
2. Dr. Tushar Kanti Halder	Principal/Secretary
3. Dr. Rajeev Kr. Jha	Govt. Nominee
4. Prof. Prakash Kanti Nayek	Govt. Nominee
5. Dr. Arunava Chattopadhyay	Nominee of W.B.S.C.H.E.
6. Dr. Shaikh Sirajuddin	BankuraUniversity Nominee
7. Dr. Suchitra Mitra	BankuraUniversity Nominee
8. Prof. Parimal Saren	Teachers' Representative
9. Dr. Sathi Mukherjee	Teachers' Representative

Teaching Staff

Principal : Dr. Tushar Kanti Haldar. M.A., Ph.D.

Bengali Dept. : Dr. Tapas Mondal , M.A. Ph.D. (H.O.D.)Asst.Professor
: Prof. Debanjana Karmakar , M.A. *(SACT-II)*

English Dept. : Prof. Parimal Saren, M.A. (H.O.D.)Asst.Professor
: Prof. Sweety Roy (Rajguru), M.A. M.Phil.Asst.Professor
: Prof. Sarbani Bera , M.A.Asst.Professor
: Prof. Satabdi Roy , M.A. *(SACT-I)*
: Prof. Medha Misra , M.A.*(SACT-II)*

History Dept. : Prof. Runu Ghosh, M.A. (H.O.D.) Asst.Professor
: Dr. Sumit Kumar Mondal, M.A., Ph.D.Asst.Professor
: Prof. Bibekananda Sinha, M.A.,*(SACT-II)*
: Prof. Tapan Kr. Pandit, M.A.*(SACT-II)*

Philosophy Dept. : Prof. Amit Koley. M.A., M.Phil. (H.O.D.)Asst.Professor
: Prof. Gargi Banerjee M.A.*(SACT-II)*

Mathematics Dept. : Dr. Sathi Mukherjee, M.Sc. Ph .D. *(H.O.D.)*Asst.Professor

Geography Dept. : Prof. Biswajit Talukdar, M.Sc.(H.O.D.)Asst.Professor
: Prof. Pavel Sarkar, M.A.*(SACT-II)*
: Prof. Moumita Garai, M.A.*(SACT-I)*
: Prof. Sumit Sen Modak, M.A.*(SACT-I)*

Sanskrit Dept. : Prof. Sourav Dey M.A.*(SACT-I) Dept.-in -charge*
: Prof. Chandan Pai M.A.*(SACT-I)*
: Prof. Suprava Dey Kundu , M.A.*(SACT-II)*

Pol. Science Dept. : Dr. Mahuya Roy Karmakar, M.A. Ph.D.(H.O.D.) Asst.Professor
: Prof. Abbasuddin Mondal, M.A.*(SACT-I)*

Phy. Education Dept.: Prof. Arghya Nayak , M.P.Ed *(SACT-II),Dept.-in -charge*

Education Dept. : Prof. Sanatan Sahoo , M.A.*(SACT-I),Dept.-in -charge*
: Prof. Bristi Mondal , M.A*(SACT-II)*

Economics Dept. : Vacant

Prof. Deb Narayan Bandyopadhyay
Vice-Chancellor
BANKURA UNIVERSITY
Main Campus. Bankura Block - II
P.O. : Purandarpur, Dist. : Bankura
Pin : 722 155 (West Bengal) India
Email : vcbkru@gmail.com
Website : www.bankurauniv.ac.in

01/BKU/40/2022 20.05.2022

MESSAGE

I have come to know that Gobinda Prasad Mahavidyalaya is going to publish its college magazine "*Balaka*" which will be a platform for the critical and creative expression of the teachers and students of the college.

I do welcome this splendid initiative. I believe that the college magazine will work as a forum for the exchange of brilliant ideas.

I wish the magazine all success.

(Deb Narayan Bandyopadhyay)
PROF. DEB NARAYAN BANDYOPADHYAY
Vice Chancellor
BANKURA UNIVERSITY

Office Staff

1. Head Clerk (vacant)	: Sri Bhabani Sankar Nayak *B.Com. (Hons)* (casual)
2. Accountant	: Vacant
3. Cashier (vacant)	: Sri Somenath Nayak *B.Com., M. Music* (casual)
4. Clerk	: Vacant
5. Office-bearer (vacant)	: Sri Susanta Kanta. Sinha, *B.A.* (casual)
6. Sweeper	: Sri Paritosh Bouri
7. Night Watchman	: Vacant
8. Darwan	: Vacant
9. Library Clerk	: Vacant
10. Office Staff	: Sri Subhankar Sen ,*B.Sc.* (Casual)
11. Office Staff	: Lakshmi Kanta Sinha, *B.A* (Casual), .
12. Office Staff	: Priyanka Roy ,*Diploma Engineer*. (Casual)
13. Office Staff	: Arnab Seth ,*B.Tech*. (Casual)

■ **প্রকাশক :** অধ্যক্ষ, গোবিন্দপ্রসাদ মহাবিদ্যালয়
■ **প্রকাশ কাল :** বৃহস্পতিবার, ২৬শে মে ২০২২(১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯)
■ **পত্রিকা শিক্ষক সম্পাদক :** ড. তাপস মণ্ডল
■ **পত্রিকা শিক্ষক সহ-সম্পাদক :** বিবেকানন্দ সিংহ

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
অধ্যক্ষের প্রতিবেদন	৯
From the Desk of Coordinator, IQAC	১০
পত্রিকা সম্পাদকের কলমে	১১
কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতির প্রতিবেদন	১২

অধ্যাপক/অধ্যাপিকাদের রচনা

☐ প্রবন্ধ

ঋষিকল্প গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ : ফিরে দেখা	ডঃ তাপস মণ্ডল	১৩
স্বয়ংবরা যশোধরা	বিবেকানন্দ সিংহ	১৭
ঈশোপনিষদে বর্ণিত শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ	চন্দন পই	২০
ভাষা-আন্দোলনে প্রতিবাদী নারীকণ্ঠ	ড. সুস্মিতকুমার মণ্ডল	২৮
যুদ্ধ ও বিশ্বমানবতাবাদ	অমিত কোলে	৩৬
রামায়ণ মহাভারতের সারসংকলন ও আমার কথা	তপন কুমার পণ্ডিত	৪০
সেকালের একালের স্বাস্থ্য চর্চা	অর্ঘ্য নায়ক	৪৩
মূল্যবোধের শিক্ষা ও বর্তমান সমাজ	সনাতন সাহু	৪৪
বাঁকুড়া ও বর্ধমানের গাজন প্রসঙ্গ	রুম্পু ঘোষ	৪৭
পশ্চিমবঙ্গের জীববৈচিত্র্য	মৌমিতা গড়াই	৪৯
আদর্শ শাসনব্যাবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র	আব্বাসউদ্দিন মণ্ডল	৫১

☐ কবিতা

নিজস্বতা ☐ বৃষ্টি মণ্ডল/৩৯ সংকেত ☐ সুপ্রভা দে কুণ্ডু/৩৯
মেয়েবেলা ☐ গার্গী ব্যানার্জ্জী/৫৩ দাবি ☐ সৌরভ দে/৫৪

☐ Essay

Covid-19 Pandemic and the Digital Divide in Education	Sweety Roy (Rajguru)	15
Mall Culture and Youths in India	Dr. Mahuya Roy Karmakar	38a

☐ Fiction

Nirmalya	Sarbani Bera	31

☐ Travel

Few natural beauties of Tarai-Dooars belt	Biswajit Talukdar	24

সূচিপত্র–২

ছাত্র/ছাত্রীদের রচনা

☐ প্রবন্ধ

চার্বাক দর্শনের আলোকে দেহাত্মবাদ বা ভূতচৈতন্যবাদ	বিজন কুম্ভকার	৭৩
ঘূর্ণিঝড় ফণী	মানস বাগ, দ্বিতীয় বর্ষ	৭৫
পর্যটনে বাঁকুড়ার কোড়ো পাহাড়	আনন্দ বাঙাল, দ্বিতীয় বর্ষ	৭৬
ডোকরা শিল্প	পিকু মহন্ত	৭৭
ডার্ক ওয়েব	কৌশিক সিংহ	৭৮
জীবনের এক কঠিন ধাপ	শ্রেয়া মাঝি বাংলা অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ	৭৯
অনলাইন ক্লাস– সুবিধা ও অসুবিধা	প্রিয়াঙ্কা দাস, ইতিহাস বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ	৮০

☐ কবিতা

গোবিন্দ স্মরণে পুষ্পাঞ্জলি ☐ পুনম বাদ্যকর/১৪
লজ্জিত মা ☐ পুষ্পেন্দু আকুলি/১৯
মেয়ে তুমি মেয়ে না হয়ে মানুষ হও ☐ কোয়েল ওঝা/৫৩
ফেসবুক ☐ মহেশ্বর ভট্টাচার্য/৫৪
নিশ্চুপ গোধূলি ☐ দোয়েল হালদার /৫৫
মা ☐ অয়ন মন্ডল/৫৫
মা ☐ দূর্বা কর্মকার/৫৬
শান্তির ভোর☐ প্রিয়াঙ্কা/৫৬
জিজ্ঞাসা ☐ সোমা মাজী/৫৬
ব্যাধি ☐ সোনেল মাজী/৫৭
গুরু ☐ শুভম মন্ডল/৫৭
প্রণাম নিও ☐ রাকেশ পরামাণিক/৫৮
গৃহবন্দী ☐ প্রীতি সিংহ/৫৮
স্বামীজীর সম্মুখে ☐ সোনিয়া সিংহ/৫৯
করোনা ☐ শান্তনু তন্তুবায় /৫৯
নারী ☐ তনুশ্রী কুন্ডু/৫৯
ক্রিকেটার বিরাট কোহলি ☐ রাহুল ঘোষ/৬০
সব দুর্গাই থাকুক সুখে ☐ পূর্বাশা পান্ডে/৬০
মিষ্টির লড়াই ☐ বৃষ্টি চট্টরাজ/৬১
১৫ই আগষ্ট ☐ মৌমিতা লায়েক/৬১
বিদ্যালয় ☐ সুজাতা পাল/৬১
অন্ধকারে আলো ☐ মল্লিকা ওঝা/৬২
শারদীয়া ☐ আবির কুমার মাঝি/৬২
বিশ্ব বিজয়ী বীর ☐ সুজাতা পাল /৬৩
মা ☐ দুবরাজ গড়াই/৬৩
খেলাধুলা স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ☐ নিশা ধীবর/ ৬৪
নারী ☐ সোনালী গরাই /৬৪
নিষ্ঠুর রে বাইশে শ্রাবণ ☐ জয়দেব ঘোষ/৬৫
মেঘলা বেলা ☐ রুমকি চক্রবর্তী/৬৫
যাত্রী ☐ রৌনক গোস্বামী/৬৫
শারদীয়া ☐ মনীষা সিংহ /৬৬
শকুন্তলা ☐ কাবেরী গরাই/৬৬
মা ☐ সুতপা মাজী /৬৭
আগমনী ☐ দেবলীনা মন্ডল/৬৭
অনুরোধ ☐ সাথী সিংহ /৬৮
প্রাণের মাঝে গান ☐ পায়েল উপাধ্যায়/৬৮
আধ রাতের যৌবন ☐ রমা মন্ডল/৬৯
The Ultimate ☐SusantaSingha
(College Staff) /৬৯
জীবন যুদ্ধ ☐ জ্যোতি বাদ্যকর/৭০
শিক্ষার্জন ☐ মনীষা চ্যাটার্জী/৭০
দুই রূপে বর্ষা ☐ পায়েল মন্ডল/৭১
ভাইরাস ☐ সোনিয়া সিংহ/৭১
ধ্বংস যজ্ঞ ☐ রাজেশ দেঘরিয়া/৭২
Night ☐ Sukla Rana /৭২

অধ্যক্ষের প্রতিবেদন

সাহিত্য সমাজের দর্পণ-স্বরূপ। সেই দর্পণে প্রতিফলিত হয় সমাজের খন্ড-চিত্র। আর সেই চিত্রের বাহক যখন ছাত্রসমাজ তখন তার গুরুত্ব অপরিসীম। গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক সাহিত্য-পত্রিকা 'বলাকা'র ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে সেই সব সুকুমার-মতি ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্যচর্চার নবীন ফসল। সাহিত্যের অঙ্গনে এদের মধ্যে ভবিষ্যতে কেউ হয়তো হয়ে উঠবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ধারক ও বাহক। আজকে 'বলাকা'র পৃষ্ঠায় যে বীজটি অঙ্কুরিত হল আগামী দিনে সেই হয়তো হয়ে উঠতে পারে মহীরুহ। সাহিত্যের সঞ্জীবনী সুধায় ভরে দিতে পারে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গন। তারই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে সাহিত্য-রসসুধা পান করবেন আগামীর পাঠককুল, এই প্রত্যয় ও প্রত্যাশাকে অঙ্গীকার করে মুক্ত আকাশে ডানা মেলুক 'বলাকা'।

এতদ্ অঞ্চলের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় 'বাঁকুড়ার গান্ধী' বলে খ্যাত, সারদা মায়ের মন্ত্রশিষ্য ঋষিকল্প গোবিন্দ প্রসাদ সিংহের নামাঙ্কিত যে মহাবিদ্যালয়ের বীজ একদা অঙ্কুরিত হয়েছিল ১৯৮৫ সালে, সে আজ ৩৭ বছরের তরুণ তুর্কি। বাঁকুড়া জেলার শিক্ষা-মানচিত্রে সে আজ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। তবে তার চলার পথ সব সময় মসৃণ নয়। তবুও সমস্ত বন্ধুরতাকে অতিক্রম করে সে আজ সমুখপানের যাত্রী। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন(UGC), রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান(RUSA) এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদন ও অর্থানুকুল্যে, নানা স্তরীয় বিদ্যানুরাগীদের বদান্যতায়, সর্বোপরি কলেজ পরিচালন সমিতির(GB) সক্রিয় সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিনিয়ত কলেজের যে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে চলেছে, সে কথা অনস্বীকার্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক অনুদানে সর্বাধুনিক সুবিধাযুক্ত মুক্তমঞ্চ নির্মাণ, স্বতন্ত্রভাবে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার নির্মাণ, ছাত্রছাত্রীদের সহায়ক দাবি দাওয়া পূরণ, সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরি, জিমনাশিয়াম, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জেলা তথা রাজ্যস্তরে উল্লেখ্যযোগ্য স্থানলাভ, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষাকে শ্রেণীকক্ষের ভিতরে এবং বাইরেও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেবার নিরলস প্রচেষ্টায় গোবিন্দপ্রসাদ মহাবিদ্যালয় নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে আজ NAAC-এর মূল্যায়নে 'B+' সংশায়িত। এতে অবশ্য আত্মতুষ্টির কোনো অবকাশ নেই, বরং আগামীতে সে নিজেকে অতিক্রম করে আরও উন্নত হতে বদ্ধপরিকর।

অধ্যক্ষ হিসাবে গোবিন্দ প্রসাদ সিংহের নামাঙ্কিত এই মহান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশ হতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করি। আমাদের সাধ অনন্ত কিন্তু সাধ্য সীমিত। তবুও, সীমিত পরিকাঠামো, অপ্রতুল অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, খুবই অল্পসংখ্যক শিক্ষাকর্মী (আংশিক সময়ের) নিয়ে কলেজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে যারা ব্রতী হয়েছেন তাদের কাছে আমি ঋণী ও কৃতজ্ঞ। আমার বিশ্বাস এই মহাবিদ্যালয়ের সুযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষায় নিজেদের স্থানটিকে ঠিক খুঁজে নেবে, ভবিষ্যত জীবনেও হবে আলোক পথের দিশারী। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই 'বলাকা' সংশ্লিষ্ট সেই সকল ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী, শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিবর্গ, সকলকে জানাই ধন্যবাদ।

ড. তুষার কান্তি হালদার
অধ্যক্ষ
গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়

From the Desk of Coordinator, IQAC

The Gobinda Prasad Mahavidyalaya had established the Internal Quality Assurance Cell (IQAC) in 2014. The IQAC being an integral part of the college works towards realizing the goals of quality enhancement by developing a system for conscious, consistent and catalytic improvement in different aspects of functioning of the college. Since the birth of the college and establishment of IQAC the college had covered a long distance. The college is now accredited with B+ by NAAC. When the college was unfolding its wings to fly, the rhythm was somehow broken by the pandemic caused by Covid 19. During the pandemic the college had to face some difficulties like other institutions. As a teacher it's really very disappointing to see the empty classroom, silent campus etc. But finally we got back the rhythm of our daily activities. So, this time my dear students, my colleagues and all well wisher of the college are about to publish our college magazine BALAKA. I am really very excited. I would like to thank the Magazine Committee as well as all those who are engaged directly or indirectly in publishing it. From the core of my heart I wish the success of BALAKA.

Parimal Saren
Coordinator, IQAC

পত্রিকা সম্পাদকের কলমে

কবি জীবনানন্দ দাশ এর কবিতায় -"বাংলায় মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর ...."এই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় বাঁকুড়াকে নিয়ে -" যে দেখেছে বাঁকুড়ার মুখ, সে আর না চায় অন্য সুখ।" বস্তুত রাঢ় বাংলার অন্যতম বাঁকুড়া জেলার সাহিত্য, সঙ্গীত , শিল্পকলার বিস্তৃত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এক গৌরবময় উত্তরাধিকার আছে। এছাড়া অসংখ্য গুণী মানুষের জন্ম হয়েছে এই জেলায়। তাঁদের মধ্যে বাঁকুড়া জেলার যে সকল দেশপ্রেমিক জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন গোবিন্দ প্রসাদ সিংহ অন্যতম। এমনই একজন ঋষিকল্প, সত্যদ্রষ্টা, ত্যাগী মহাপুরুষের নামেই নামাঙ্কিত গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়। এই মহাবিদ্যালয়ের মাননীয় অধ্যক্ষ, ড.তুষারকান্তি হালদার মহাশয়। তাঁরই উদ্যোগে কলেজের বার্ষিক পত্রিকা 'বলাকা ' যথাসময়ে প্রকাশিত হতে চলেছে।

এখন যেহেতু আমরা এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে যখন করোনার থাবা সমস্ত বিশ্বে। এ প্রসঙ্গে একটা লাইন মনে পড়ছে-

এক ভয়াবহ অসুখে ভুগছে পৃথিবী আজ বহুদিন
কুৎসিত কদাচার অসুখে
পৃথিবী হারিয়েছে তাঁর সরল কোমল অবয়ব
সৌন্দর্য

এরকম পরিস্থিতিতে আমাদের জ্ঞানচর্চা, সাহিত্যচর্চা, আলাপ আলোচনার মতো সুকুমার প্রবৃত্তিগুলি থেমে যায়নি। তারই সুবাদে 'বলাকা' পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে । বহু গুণীজনের মননশীল লেখনীতে সমৃদ্ধ এই পত্রিকাটি। আশা করি এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ,কবিতা, অনুগল্প, ছোটগল্প সমূহ বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের নব নব ভাবনা চিন্তার প্রেরণা দেবে ও সহায়ক হবে। সকলের সমবেত সহায়তার ভরে ওঠা এই পত্রিকার অর্ঘ সবারই জন্যে।

গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়ের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী সুস্থ সংস্কৃতির ধ্বজা তুলে ধরে সমগ্র জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের প্রতিভাত করার জন্য এই বার্ষিক পত্রিকার অংশীদার হয়ে পত্রিকা প্রকাশের জন্য সাহায্য করেছেন তার জন্য সকলকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা, নমস্কার, প্রীতি ও শুভেচ্ছা এবং অসংখ্য ধন্যবাদ।

সর্বোপরি শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহাশয় এই পত্রিকা প্রকাশের জন্য যে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন তার জন্য ওনাকে জানাই সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্রা' কাব্যের 'শেষ উপহার' কবিতার সেই বিখ্যাত পংক্তি মনে পড়ে –

যাহা কিছু ছিল সব দিনু শেষ করে–
ডালাখানি ভরে
কাল কী আনিয়া দিব যুগল চরণে
তাই ভাবি মনে

এ বছর এই পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে ডালা ভরে সমস্ত উজাড় করে দিয়েছি। আগামী বছরের জন্য এখন থেকেই তার হোমযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে। তবে যাদের কথা ভেবে এ বছরের এই যে প্রয়াস তারা উপকৃত হলেই সব সার্থক হবে।

ড. তাপস মণ্ডল
পত্রিকা সম্পাদক
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়।

বি.দ্র.-প্রত্যেক লেখক/লেখিকার লেখার সত্যতা ও দায়ভার একান্তই তাঁদের,এতে কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং পত্রিকা সম্পাদকের কোন দায়ভার নেই।

কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতির প্রতিবেদন

"কাল ছিল ডাল খালি আজ ফুলে যায় ভরে" -রবীন্দ্রনাথ

গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা 'বলাকা' প্রকাশের কথা শুনে আনন্দিত হলাম। ঋষিকল্প গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন আমার বহুদিনের, সেই ছাত্রাবস্থা থেকেই। বিগত দুবছর ধরে বিশ্বব্যাপী করোনার মতো অতিমারীর থাবায় শিক্ষাব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে পড়লেও আমাদের মহাবিদ্যালয় সমস্ত করোনা বিধি অনুসরন করে উন্নয়নে সামিল হয়েছে। আজকের এই মহাবিদ্যালয়ের পরিবেশ, কাঠামো, পঠন পাঠন, সৌন্দর্য যা চোখে পড়ে বিগত দিনগুলিতে তা অনালোকিত ছিল। ১৯৮৫ সালে কলেজের পথচলা শুরু। বর্তমানে কলেজের সার্বিক উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক মধুর। কলেজের সামগ্রিক ফলাফলও আশা ব্যঞ্জক। বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোলের পাশাপাশি সংস্কৃত ও দর্শন বিভাগের অনার্স কোর্স চালু হয়েছে। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। শারীর-শিক্ষা, শিক্ষা বিজ্ঞান বিষয়ে নতুন কোর্স চালু হয়েছে। পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষকও বর্তমান। NAAC এর মূল্যায়নে কলেজের B+ Grade পেয়েছে। এটা আমাদের কাছে খুবই সম্মানের বিষয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মা মাটি মানুষের সরকারের বদান্যতায় কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিশেষভাবে উপকৃত। এই সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম -কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, বিবেকানন্দ মেরিট কাম স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড বর্তমানের কলেজ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাঙ্গনে নূতন উদ্যমে যোগদানের যে জোয়ার এনেছে তা অনস্বীকার্য। শুধু তাই নয় বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় এই মহাবিদ্যালয় নবকলেবরে সেজে উঠেছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সহযোগিতা এবং নানাস্তরের শুভাকাঙ্ক্ষীদের বদান্যতায় কলেজের শ্রেণীকক্ষের সংখ্যাবৃদ্ধি, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার নির্মান,অভিনব সাংস্কৃতিক মুক্তমঞ্চ নির্মাণ, ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের জন্য উন্নত ক্যান্টিন নির্মাণ,পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা, করোনা মহামারী মোকাবিলায় উপযুক্ত সেনিটাইজেশন ব্যবস্থা,এছাড়া অত্যাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো উন্নততর করার প্রয়াস প্রশংসার দাবী রাখে। কলেজের সমস্ত উন্নয়নের যিনি কান্ডারী সেই অধ্যক্ষ মহাশয়কে আমার হার্দিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। কারণ তার নিরলস প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা ব্যতীত মহাবিদ্যালয়ের এই কর্মকান্ড কখনও সাফল্যলাভ করত না বলে আমি মনে করি।

ঋষিকল্প গোবিন্দ প্রসাদ সিংহের নামে নামাঙ্কিত কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসাবে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত ও গর্বিত। 'বলাকা' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত সমস্ত অধ্যাপক/ অধ্যাপিকাবৃন্দ শিক্ষাকর্মীগণ এবং ছাত্রছাত্রীদের আমার অন্তরের শুভেচ্ছা জানাই। আশা করব আগামী দিনে বলাকা পত্রিকা ফুলে ফলে আরো প্রস্ফুটিত হবে। বহু সুকুমার মতি মনের রবিরশ্মির আলোকে উদ্ভাসিত হবে। সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে আমার প্রতিবেদন শেষ করছি।

হৃদয়মাধব দুবে
সভাপতি, কলেজ পরিচালন সমিতি
গোবিন্দপ্রসাদ মহাবিদ্যালয়

প্রবন্ধ

ঋষিকল্প গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ : ফিরে দেখা

ড. তাপস মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট জেলা বাঁকুড়া। এই বাঁকুড়া জেলা ছোটনাগপুর মালভূমি এবং গাঙ্গেয় সমভূমির সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। বাঁকুড়া জেলা বলতে যে ছবি আমাদের চোখে ভেসে ওঠে তা হল-

"ডাঙ্গা জুরি কাঁকর মাটি টুসু ভাদু বাউল গানে
নানা প্রবাদে লোক-ক্রীড়ায় বাঁকুড়া কে সবাই জানে ॥"

অর্থাৎ ডাঙ্গা, ডহর, টিলা, ডুংরি, লাল কাঁকুড়ে মাটি, তারই বুকে শাল, পিয়াল, মহুয়ার বন। এই অসামান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাদের মনকে নাড়াই দেয়না, আকৃষ্টও করে। আর এই প্রকৃতির সৌন্দর্যের মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। এই ছোট ছোট গ্রামগুলিতে বৃহৎ জনজীবন গড়ে উঠেছে। এক কথায় এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জনজীবনকে আশ্রয় করে বাঁকুড়া জেলার গ্রামে, পথে প্রান্তরে, নদী-নালায়, শাল-পলাশের নিচে, টিলা ডুংরিতে, দিঘির পাড়ে, বধূর শাড়ির আঁচলের মধ্যে এক বৈচিত্র্যপূর্ণ লোকসংস্কৃতির পরিমন্ডল গড়ে উঠেছে। তাই এই অঞ্চলের মাটি ও মানুষ এক অনন্য স্বাতন্ত্র লাভ করেছে।

এখন এমনই একজন মানুষের কথা বলবো যিনি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ। ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ৯ই জ্যৈষ্ঠ গঙ্গাজলঘাটি থানার অন্তর্গত কনেমারা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দিবাকর সিংহ, পিতামহ অর্জুন সিংহ ছিলেন এই এলাকার ভূম্যধিকারী। এমন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি নিজেকে আর্তের সেবায় সর্বক্ষণ নিযুক্ত করেন। প্রমাণ স্বরূপ ছাত্রাবস্থাতেই তিনি বাঁকুড়ার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। বি.এ. পাস করার পর তিনি গঙ্গাজলঘাটি স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। গান্ধীজী পরিকল্পিত এই স্কুলকে তিনি জাতীয় স্কুলে পরিণত করেছিলেন। এজন্য আজীবন তাঁকে মাস্টারমশাই বলা হত। শিক্ষকতা ও পীড়িত মানুষের সেবার পাশাপাশি তিনি দেশমাতৃকার সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। যাঁর অনুপ্রেরণা পেয়েছেন, তিনি স্বয়ং শ্রী শ্রীমা সারদা দেবী। গোবিন্দপ্রসাদ ছিলেন স্বয়ং শ্রী শ্রীমা সারদা দেবীর সাক্ষাৎ শিষ্য। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন, মা তাঁকে দেশের শৃঙ্খলামোচন করার কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলেছিলেন। মায়ের নির্দেশ আজীবন পালন করেছেন গোবিন্দপ্রসাদ। দেশমাতৃকার সেবাই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। ইংরেজ শাসনের প্রতি তাঁর প্রচন্ড বিরোধিতা ছিল, তাই গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে মানুষকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতেন। অত্যন্ত সক্রিয় ভাবে যোগ দিয়েছিলেন ১৯২১সালের প্রথম অসহযোগ আন্দোলনে, ১৯৩০সালের আইন অমান্য আন্দোলনে, ১৯৩২ গান্ধী-আরউইন চুক্তি ব্যর্থ হওয়ার পর সংঘটিত আন্দোলনে এবং ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনে। প্রতিবারেই ব্রিটিশ পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়েছে। তবুও ব্রিটিশ সরকার দমাতে পারেনি গোবিন্দবাবুকে। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম তাঁর নেতৃত্বে অমরকানন আশ্রম থেকেই পরিচালিত হতো। যে অমরকানন আশ্রম স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী ১৯২৫ এর ৮ই জুলাই উদ্ঘাটন করেন। এই আশ্রমে নজরুল ইসলাম এসে "অমরকানন মোদের অমরকানন" গানটি রচনা করেন, যেটি এখনো অমরকানন স্কুলে প্রার্থনা সঙ্গীত হিসেবে গাওয়া হয়। এইসব কার্যকলাপের জন্য ব্রিটিশ সরকার অমরকানন কে Hot bed হিসেবে চিহ্নিত করে। ফলে বাজেয়াপ্ত হয়

অমরকানন আশ্রম। এত কিছুর পরেও তিনি থেমে থাকেননি, কেননা তাঁর কাঁধে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের ভার অর্পিত ছিল। একাধিকবার তিনি বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। এই অমরকাননে মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ছুটে এসেছেন যার নেপথ্যে রয়েছেন একজনের নাম, তিনি হলেন গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ। সত্যি কথা বলতে কি গোবিন্দপ্রসাদ এবং তার সৃষ্টি অমরকানন কে কেন্দ্র করেই বেশ কয়েকটি দশক-এ জেলার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন আবর্তিত হয়েছে। এজন্য তাকে বলা হত বাঁকুড়ার গান্ধী। কিন্তু ১৩৬১ বঙ্গাব্দের ১লা পৌষ আকস্মিকভাবে বাঁকুড়াবাসীকে কাঁদিয়ে মা সারদার কোলে অক্ষয় নিদ্রায় নিদ্রিত হন। পড়ে থাকে তার নিজের হাতে তৈরি আধুনিক বাঁকুড়া জেলা, পড়ে থাকে অমরকানন, পড়ে থাকে রামকৃষ্ণ সেবাদল আশ্রম।

বাঁকুড়ার পূণ্যভূমিতে এমন মহান মানুষের জন্মের জন্য আমরা গর্বিত। তাই বাঁকুড়াবাসী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে বাঁকুড়াতে বেশ কয়েকটি এলাকা ও রাস্তা এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, যা খুবই অভিনব। যথা কনেমারা গ্রামের নাম বদলে গোবিন্দধাম, বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালটি যেখানে অবস্থিত সেই এলাকাটিও তাঁর স্মৃতির সাক্ষী হয়ে গোবিন্দনগর নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এছাড়াও অমরকাননের কাছাকাছি যে ডিগ্রী কলেজ গড়ে তোলা হয়েছে সেটিও গোবিন্দপ্রসাদ এর নামে নামাঙ্কিত। তার প্রতি জেলাবাসীর ভালোবাসা কতখানি গভীর ও আন্তরিক এসব ঘটনা থেকেই তা বোঝা যায়। তাঁর নামাঙ্কিত কলেজে অধ্যাপনার সাথে যুক্ত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এই মহান মানুষের চরণে আমার শতকোটি প্রণাম।

❒ কবিতা

গোবিন্দ স্মরণে পুষ্পাঞ্জলি

পুনম বাদ্যকর

তৃতীয় বর্ষ

ঋষিকল্প গোবিন্দপ্রসাদ
কর্মসাধক, সর্বত্যাগী।
প্রণমি তোমায় হে মহাপ্রাণ
যোগসিদ্ধ হে বৈরাগী।
চিরকুমার, ব্রহ্মচারী
সেবামন্ত্রে দীক্ষিত
কর্মপ্রেমের যুগল মূর্তি
তুমি প্রেমিক সত্যাশ্রয়ী।
তমসাপূর্ণ বিজন ভূমিতে
তুমি যে জ্ঞানের প্রভা।
তোমারই আভায় উষ্ণ মরুতে
কমল ফোটে বিরাজে শোভা।

মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত তুমি
সেবক দীন দুঃখী অভাজনের,
সমাধি লভিলে হে মহাযোগী
লীলা নিকেতন অমরকাননে।
তপোবন ছিল হে দেবঋষি।
বক্ষে ধরিয়া তব চরণরেণু
তীর্থ হল যে নব বারানসী।
তুমি মহাপ্রাণ গোবিন্দপ্রসাদ
তব আশীর্বাণী শীর্ষে ঝরুক
জীবন মোদের ধন্য হউক।

❒ Essay

Covid-19 Pandemic

and the Digital Divide in Education

Sweety Roy (Rajguru)

Assistant Professor, Department of English

For over a year now the world is facing an overwhelming situation at the outbreak of Covid-19 Pandemic.It has taken a toll on the lives of millions of people worldwide and has laid bare the fragility and insufficiency of the health care system and claims of advanced medical science we could boast of. But this is much more than a health crisis. It is a human, economic and social crisis. It has affected all segments of the population and is particularly detrimental to the members of those social groups in the most vulnerable situations, continues to affect older persons and persons with disabilities. It has been over a year since schools,colleges, universities across the country were forced to shut in the wake of Corona virus Pandemic which has wrecked our lives. Among many other unprecedented threats which this Pandemic has brought to the fore is the digital divide which has made Education accessible and affordable only to privileged class of people. The Pedagogic dictionary (1967) defines the democratization of education as the "availability of education to as many as possible number of children and the right to upbringing, education and schooling to all citizens of a nation, without discrimination in terms of gender, language, religion, class and race." If we go by this definition then universal literacy and democratization of education, goals which it took years to achieve, have suffered a serious setback as a result. The 'new normal' in Education has introduced ways of learning and has triggered many sociological issues which have come hard on the heels, one of those is the increasing distance between education and democratic ideals.

India, the world's largest democracy, has the largest education system with over 250 million students enrolled in some 1.5 million schools and another 37.4 million students enrolled in approximately 50000 Higher Educational institutions. The Covid-19 lockdown has suspended physical classes in educational institutions across the country making it imperative for the teachers to take to online mode of teaching- learning and assessment.

But this rapid shift to e-learning prompted by the Pandemic has resurfaced the long-standing issues of inequality and a digital divide in India that must be addressed by future economic, educational and digitalisation policies.

Technological literacy is a challenge that is confronting both parents and students as most of them rely on basis phones and not Android phones which are required for online classes and access to e- resources.

Mobile connectivity is another major issue, especially in the hinterlands. In some areas Mobile connectivity is barely enough to make phone calls. A high-speed internet connection is required to access course material over the internet. With patchy connections and the constant buffering of videos kill the interest of students. The students log out the moment connectivity is disrupted or the data pack expires.

In a country where girls are often viewed as a burden and their education a privilege the new found barriers have only heightened the challenges. Lockdown and lack of resources have made it worse for young girls to study. Closing down of the educational institutions has caused them to stay at home and it has increased the domestic responsibilities on them, as a result the girls are getting even less time to study as they are compelled to invest extra hours to household chores. While the girls are living under the pressure of getting married, lack of resources is forcing teenage boys to work as labourers and quit studies. Buying gadgets to continue their online classes is next to luxury for students who do not even get one square meal. Sometimes these students borrow gadgets from their neighbors to attend classes and download study materials or submit their assignments, this dependence increases the problem because if that neighbor is away for some reason or have some work to be completed over phone and cannot afford to lend the phone, that particular student is deprived of attending classes.

The problem which is facing us today has affected all of us on different levels. But we should not be cowed down by the problem. We should stand united to pull each other up from this dismal condition. Analysing and criticizing the present order will not suffice to serve our purpose of eliminating the peril. Solution must issue from the problem itself. We can take up multifarious strategies to tackle the problem. Government should develop libraries for economically weaker students from where they can borrow gadgets and later return them. Panchayats and communities should create groups in villages where they can be given tablets with study materials already downloaded into it without requiring the internet connection. Government can help the students with free data packs to study. Community servers can be created for students who can download content from these networks. For sure the pandemic has created havoc in our lives. But it's the children and especially those from economically weaker sections who have felt the brunt without regular classes, without adequate digital infrastructure the education of these children have suffered a big blow.

❒ প্রবন্ধ

স্বয়ংবরা যশোধরা

বিবেকানন্দ সিংহ

শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ

বুদ্ধ পূর্ণিমা সারা বিশ্বে বেশ শ্রদ্ধা ভরে পালিত হয়। কিন্তু অতি আর্শ্চযের বিষয় হল যে,ঐ একই দিনে বুদ্ধজায়া যশোধরাও জন্মেছিলেন। অর্থাৎ বুদ্ধের ও যশোধরার জন্মদিন একই দিনে। শুধু যশোধরা নয়,বুদ্ধের প্রিয় ঘোড়া কন্থক, সারথি ও বিশেষ বন্ধু ছন্দক,প্রিয়তম শিষ্য ও সর্বক্ষনের ছায়াসঙ্গী আনন্দ ঐ একই দিনে জন্মেছিলেন। কিন্তু মহান বুদ্ধের জন্মদিন পুন্য বুদ্ধপূর্ণিমাকেই সকলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে অন্যদের জন্মদিন ততোটা মূল্য পায়নি ইতিহাসের পাতায়। ইতিহাসের অনেক অজানা কথা বিস্মৃতির অতলে ডুবে আছে। গুরুত্বপূর্ণ হলেও গুরুত্বহীন। খুঁজলে হয়তো এমন হাজারো সত্য উদঘাটিত হবে। সে রকমই এক অজানা কাহিনী তুলে ধরার এক ক্ষুদ্র প্রয়াস এই কলমে।

শাক্য বংশীয় রাজপুত্র সিদ্ধার্থের সঙ্গে কোলিয় বংশীয় মতান্তরে শাক্যবংশের রাজা সুপ্পবুদ্ধের কন্যা যশোধরা বা গোপার বিবাহ এক বিচিত্র ব্যাপার ছিল। যশোধরার মামা বাড়ি ছিল কপিলাবস্তু নগরীতে। সিদ্ধার্থের পিতা রাজা শুদ্ধোধন ছিলেন যশোধরার মামা। সেই হিসেবে সিদ্ধার্থ ছিলেন তার মামাতো ভাই। রাজা শুদ্ধোধন গভীর চিন্তামগ্ন, কারণ রাজজ্যোতিষির গননা অনুসারে রাজপুত্র সিদ্ধার্থের/ গৌতমের সন্ন্যাস যোগ আছে। তাই পুত্রকে সংসারের মায়ার বাঁধনে বেঁধে রাখার জন্য একমাত্র বিবাহকেই উপযুক্ত রাস্তা হিসাবে বেছে নিলেন। পাত্রী সম্পর্কিত অভিমত যখন সিদ্ধার্থের নির্কট জানতে চাওয়া হয় তার উত্তরে তিনি জানান,৭ দিন পর তার মতামত জানাবেন। 'ললিত বিস্তার' গ্রন্থ হতে জানা যায়-৭দিন পর তিনি জানান যাকে তিনি বিবাহ করবেন,তিনি হবেন শাস্ত্রজ্ঞ সুশিক্ষিতা,অতীব সুন্দরী ,তবে সৌন্দর্য নিয়ে কিন্তু তার কোন অহংকার থাকবেনা ,স্নেহশীলা ,দানশীলা ত্যাগী, পরপুরুষে আসক্তিহীনা, বসনে ভূষনে লজ্জাশীলা,ধার্মিক ও কায়মনোবাক্যে শুদ্ধ, মাতৃ ও মৈত্রী ভাবাপন্ন মানুষ। কিন্তু এমন সর্বগুণভাবাপন্ন পাত্রী পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল বলা যায়।

রাজকুমারী যশোধবার মধ্যে কিন্তু এই সমস্তগুণ গুলিই ছিল। পিতা শুদ্ধোধন বেশ সমস্যায় পড়লেন, এখন পাত্রী পাবেন কোথায় ? বললেন ছেলেই খুঁজে নিক এমন সর্বগুণ সম্পন্ন পাত্রীকে। তবে পাত্রী খোঁজার কাজে ছেলেকে সবরকম সাহায্য করবেন। পাত্রী খোঁজার পন্থাটি কিন্তু বেশ চমকপ্রদ ছিল।

প্রাসাদ সংলগ্ন মনোরম রাজউদ্যানে রাজা শুদ্ধোধন আয়োজন করলেন এক সুন্দরী মেলার। রাজপুত্র গৌতম সেখানে রত্নসিংহাসনে নত মস্তকে বসে আর বাহারী সজ্জায় সেজে লজ্জা রাঙা সুন্দরীরা একের পর এক কুমার গৌতমের সামনে দিয়ে পার হতে থাকলেন। কুমার নতমুখে থাকলেন, কারো দিকে তাকালেন না শুধু নিঃশব্দে সম্মান জানিয়ে সকলের হাতে উপহার তুলে দিলেন মাথা নিচু করেই । সবাই হতাশ, মহারাজ তো সম্পূর্ণ নিরাশ, সর্ব চেষ্টাই বুঝি বিফলে গেল। সবশেষে একজন এলো,শাক্য বংশীয় মতান্তরে কোলিয় বংশীয় রাজা সুপ্পবুদ্ধের কন্যা রাজকুমারী যশোধরা বা গোপা। সর্বগুণ সম্পন্না , অপরূপ সৌন্দর্যে মেনকা উবর্সীদের ও হার মানায়। সকলে মোহিত এই অপরূপ রূপের ছটায়। সামনে আসতেই রাজকুমার গৌতম বা সিদ্ধার্থ মুখ তুলে তাকালেন। বিমুগ্ধ সিদ্ধার্থের পদ্মলোচন সৌন্দর্যের অতল সমুদ্রে বিলীন হয়ে গেলো। মুহূর্তেই হয়ে গেলো শুভদৃষ্টি, চোখে চোখে বুঝি বহু কথা হয়ে গেলো । উপহার দিতে গিয়ে কুমার দেখলেন সব উপহার শেষ।

রাজকুমারী স্মিত হেসে জানালো কি অপরাধে আমি উপহার থেকে বঞ্চিত হলাম। মধুর হাসিতে সিদ্ধার্থ বললেন তোমাকে তো সেই ছোট্ট বেলা থেকে চিনি। জানতাম তুমি সকলের শেষেই আসবে। অগত্যা কি করা যায়, নিজের হাতের বহুমূল্য হীরের আংটি যশোধরার হাতে পরিয়ে দিলেন। সেই আনন্দঘন মধুর দৃশ্য সকলে ধন্য হয়ে গেলো। রাজা শুদ্ধোধন চিন্তামুক্ত হলেন, মন তৃপ্ত হলো।

কিন্তু তবুও বিবাহের পথ প্রশস্ত ছিল না। রাজা শুদ্ধোধন পুত্রের মত জানার পর যশোধরার পিতা রাজা সুপ্রবুদ্ধের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে দূত পাঠালেন। প্রচন্ড আত্মমর্যাদা সম্পন্ন রাজা সুপ্রবুদ্ধ উত্তর পাঠালেন - কুল,প্রথা অনুসারে রাজকন্যা যশোধরা স্বয়ংবরা হবেন। শৌর্য,বীর্য, দক্ষতা দেখিয়ে যে ক্ষত্রিয় বীর শ্রেষ্ঠ হবেন তার সঙ্গেই যশোধরার বিয়ে হবে। যশোধরা পড়লেন মহাবিপদে,কারণ তার মনপ্রাণ সবই তো দিয়েছেন কপিলাবস্তুর রাজকুমার কে। মনের সিংহাসন জুড়ে বসে রয়েছেন শুধুই কুমার সিদ্ধার্থ । উৎকণ্ঠায় চোখের ঘুম উধাও .যদি স্বয়ংবর সভায় রাজকুমার শ্রেষ্ঠ প্রমানিত না হন তাহলে ? পিতার সম্মান রাখতে তো অন্যত্র বিয়ে করতে হবে। যশোধরাকে বিয়ের জন্য বহু বীর কুমার স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত, এমনকি তাঁর সব তুতো ভাইয়েরা শাক্যবংশের দেবদত্ত, নন্দ,আনন্দ সকলেই এসেছেন। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে এ কেমন রীতি ? তুতো বোনকে বিয়ে করতে সব ভাইয়েরা উপস্থিত। উত্তরে বলা যায়,তৎকালীন শাক্য সমাজে তুতো ভাই বোনদের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ও সমাদৃত ছিল।

ভাবতে অবাক লাগে পরবর্তী কালে অহিংসার প্রতিমূর্তি বলে খ্যাত যিনি, যার কাছে আশ্রয় নিয়ে বহু রাজা অস্ত্র ত্যাগ করে মোক্ষ লাভের আশায় নিজেকে সমর্পন করেছিল সেই তিনি কিনা যশোধরাকে পাওয়ার জন্য স্বয়ংবর সভায় সকলের সম্মুখে মল্লযুদ্ধ,ধর্নুবিদ্যা,অসিচালনা,অশ্বচালনার মতো বীরত্বের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন। সাতদিন ধরে বীরত্বে সেরা বাছাই এর প্রতিযোগিতা চলল। এই শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই সিদ্ধার্থর কাছে কিন্তু খুব একটা সহজ ছিলনা। বিশেষত দেবদত্তের উপস্থিতি তা প্রমাণ করে। আমরা জানি বাল্যকাল হতেই ভাই দেবদত্ত ছিলেন সব বিষয়েই সিদ্ধার্থের প্রতিদ্বন্দ্বী। সিদ্ধার্থকে তিনি খুব একটা পছন্দ করতেন না । সুতরাং স্বয়ংবর সভায় যশোধরাকে লাভ করার ইচ্ছে নিয়ে তিনি স্বভাবতই উপস্থিত হলেন। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও সাধ্য ছিলনা । সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে হতবাক করে সব বিষয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করলেন রাজকুমার সিদ্ধার্থ। অশ্বচালনা থেকে অসিচালনায় সকলকেই টেক্কা দিয়ে গেলেন । উপস্থিত সভাসদ,গুনীজন, জনগন সকলেই বিমুগ্ধতায় সিদ্ধার্থের বীরত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আর যশোধরা তো সেই কোন বাল্যকাল থেকেই তাঁর প্রতি মুগ্ধ ছিলেন।

শেষ প্রতিযোগিতায় সকলকে রুদ্ধশ্বাস করে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভাই দেবদত্তকে পরাস্ত করে সিদ্ধার্থ জয়মুকুট লাভ করলেন। এই যে বিরাট সাফল্য শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন কোন কিছুই কিন্তু তার মনকে ছুঁয়ে গেলোনা। শান্ত, সৌম্য ও স্নিগ্ধ মুখমন্ডলে মৃদু হাসির ছোয়া। এক পলক দৃষ্টিতে যশোধরার হৃদয় তোল পাড় করে ধীর পায়ে কুমার সিদ্ধার্থ এগিয়ে গেলেন পিতা শুদ্ধোধনের কাছে । প্রনাম করে জয় মুকুট পিতার পায়ের কাছে রাখলেন। রাজা শুদ্ধোধন,পিতা শুদ্ধোধন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গর্বিত বক্ষে পুত্রকে টেনে নিলেন। সমস্ত সভা ধন্য ধন্য রবে গমগম করে উঠল।

এরপর বিবাহে আর কোন বাধা রইলো না। পিতা সুপ্রবুদ্ধ শুভক্ষনে রাজকন্যা যশোধরাকে রাজকুমার সিদ্ধার্থকে হাতে তুলে দিলেন। যশোধরা নত আঁখিতে,সলজ্জদৃষ্টিতে, কম্পমান হাতে সিদ্ধার্থকে কে বরমালা পরিয়ে দিলেন। পুষ্পবৃষ্টি জয়ধ্বনি হতে থাকল। যশোধরা নিশ্চিন্ত হলেন তার মনের ইচ্ছে পূরণ হলো। ভারতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মার জীবনসঙ্গী হলেন তিনি। রাজা শুদ্ধোধন শাক্যকুল লক্ষী ও রাজপুত্রকে নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে এলেন।

এরপরের দুঃখজনক ঘটনা তো আমরা সবাই জানি। যশোধরার সংসার জীবন দীর্ঘস্থায়ী ছিলনা। অনিবার্য যা তাই ঘটল একদিন। ভোগ বিলাসের মোহ ও পিতা-স্ত্রী পুত্রের মায়ার বন্ধন কাটিয়ে গৌতম গৃহ ত্যাগ করলেন মুক্তির সন্ধানে। ভাগ্য বিড়ম্বিতা যশোধরা স্বল্প সুখের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে নীরবে চোখের জলে স্বামীর বিদায় যাত্রাকে মেনে নিলেন।পরবর্তীকালে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং নিজেকে প্রকৃত স্ত্রী, মাতা এবং সন্ন্যাসীনি রূপে প্রমান করেন।

তথ্যসূত্র :-

১. নির্বাণে অনির্বাণ বুদ্ধ ভগবান-সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। ২. ভারত ইতিহাস সন্ধানে- দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায়। ৩. ভারতবর্ষের ইতিহাস- গোপালচন্দ্র সিংহা। ৪. বৌদ্ধধর্ম- সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫. ফেসবুক-

* * *

'জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনটি পাওয়ার জন্য কিছু খারাপ দিনের সম্মুখীন হতেই হবে ....'– ভগবান বুদ্ধ

লজ্জিত মা

পুষ্পেন্দু আকুলি, তৃতীয় বর্ষ শারীরশিক্ষা বিভাগ

মাগো আমায় এই পৃথিবীর আলো কেনো দেখালে
যদি দেবেই না এ জগৎকে দুচোখ ভরে দেখতে...
মাগো আমায় এই পৃথিবীর আলো কেন দেখালে
যদি পারবেই না তোমার বুকের উষ্ণতায় জড়িয়ে রাখতে
মাগো আমায় এই পৃথিবীর আলো কেন দেখালে
যদি বলতেই দেবেনা মা বলে ডাকতে...
মাগো আমায় এই পৃথিবীর আলো কেন দেখালে
যদি লজ্জায় মুখ হয় ঢাকতে...
যদি আমায় রাস্তায় ছুড়ে হয় ফেলতে...
মাগো আমায় এই পৃথিবীর আলো কেন দেখালে
যদি কুকুর বেড়ালের হাতে দিতে হয় ছিড়তে...
বড়ো আশায় এসেছিলাম মাগো তোমার গর্ভে
ভেবেছিলাম আমায় পেয়ে দুচোখ তোমার ভরবে
ইতি-
তোমার পরিত্যাক্ত সন্তান।

❒ প্রবন্ধ

ঈশোপনিষদে বর্ণিত শিক্ষনীয় বিষয়সমূহ

চন্দন পই

শিক্ষক, সংস্কৃত বিভাগ

ঈশোপনিষদ্ (শুক্লযজুর্বেদীয়বাজসনেয়-সংহিতোপনিষদ্) হল ক্ষুদ্রতম উপনিষদ্ গুলির মধ্যে অন্যতম। এটি শুক্ল যজুর্বেদের সর্বশেষ অধ্যায় রূপে পরিচিত। ঈশোপনিষদ্ হল একটি মুখ্য উপনিষদ্, কারণ স্বরূপ বলা যায় শঙ্করাচার্য এই উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেছেন। বেদের কাণ্বও মধ্যন্দিন শাখায় এই উপনিষদ্ প্রাপ্ত হয়। এই উপনিষদের মন্ত্র সংখ্যা ১৮।

হিন্দু দর্শনের বেদান্ত শাখার একটি প্রধান ধর্মগ্রন্থ হল ঈশোপনিষদ্। এই গ্রন্থটি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে একটি প্রভাবশালী শ্রুতিশাস্ত্র হিসেবে গৃহীত হয়েছে। গ্রন্থের প্রথম শ্লোকের প্রথম দুটি শব্দ ('ঈশা' এবং 'বাস্যম') থেকে এই উপনিষদ্‌টির নামটির উৎপত্তি। ঈশা বাস্যম্ শব্দদুটির অর্থ ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত বা ঈশ্বরে (আত্মায়) নিহিত। এই গ্রন্থে হিন্দুধর্মের আত্মতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয় শাখাতেই এই উপনিষদের নিজস্ব ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

উপনিষদের মূলমন্ত্র

''ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যায় জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"- অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। জীব এবং ব্রহ্ম ভিন্ন নয় এটাই উপনিষদের মূলমন্ত্র। এই তত্ত্বের উপলব্ধির মাধ্যমে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে জীবের অবিদ্যাগ্রস্ত এই জগত থেকে মুক্তি ঘটে। উপনিষদ সমূহের ব্রহ্ম জ্ঞান লাভের উপায় রূপে জ্ঞান ও কর্ম এই দুটি পথ এর উপদেশ তুলে ধরা হয়েছে।

উপনিষদের আলোচ্য বিষয়বস্তু

কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ঘটলেই জ্ঞানমার্গের অধিকারী হয় এবং জ্ঞানের দ্বারায় জীবের মুক্তি ঘটে। উপনিষদ্‌গুলিতে এই উভয় মার্গের যেমন প্রশংসা করা হয়েছে তেমনি এদের একক মার্গের নিন্দার মাধ্যমে তাদের সহাবস্থানের প্রশংসা তুলে ধরা হয়েছে এছাড়া উপনিষদে আত্মজ্ঞান আত্মদর্শীর স্বরূপ,ভক্তি প্রভৃতি বিষয়ে অবতারণা করা হয়েছে উপনিষদের আলোচ্য বিষয়বস্তু গুলির মধ্য দিয়েই তার শিক্ষাকে সুকৌশলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

ঈশোপনিষদে শিক্ষনীয় বিষয়

বাজসনেয়ী সংহিতার অন্তর্গত হলো ঈশোপনিষদ। মাত্র ১৮টি মন্ত্রে এই উপনিষদ রচিত। উক্ত মন্ত্রে উপরের বিষয়গুলি সংক্ষেপে অথচ যুক্তিসহকারে যেভাবে আলোচিত হয়েছে তার মধ্যেই তার শিক্ষণীয় বিষয় গুলি সুকৌশলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

ঈশোপনিষদে বিষয় আলোচনা

এই ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে বলা হয়েছে ব্রহ্ম আত্মারূপে জগতের চরাচর সমস্ত প্রাণীর মধ্যে বিরাজমান তাই তিনি সর্বব্যাপী। সর্বব্যাপী ব্রহ্ম জ্ঞান ছাড়া জীবের মুক্তি সম্ভব নয় আবার ত্যাগ ছাড়া এই জ্ঞান লাভও সম্ভব নয়।

ঈশোপনিষদে শিক্ষা

সমস্ত মুমুক্ষু জীবের উদ্দেশ্যে এই উপনিষদের শিক্ষা হল-'' তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্" অর্থাৎ ত্যাগ এর দ্বারা ভোগ করো এবং নিজের ও অপরের ধন সম্পদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা বর্জন করো। কিন্তু সকল মানুষের পক্ষেই এই আকাঙ্ক্ষা সহজে ত্যাগ করা সম্ভব নয়। আকাঙ্ক্ষা ত্যাগের জন্য ঈশোপনিষদ শাস্ত্রবিহিত কর্ম বা নিষ্কাম কর্ম পালনের শিক্ষা দিয়েছে। এবং বলেছে যতদিন না চিত্ত শুদ্ধি হয় ততদিন এই কর্ম পালন করতে হবে প্রয়োজনে একশত বছর বেঁচে থাকার ইচ্ছা পোষণ করতে হবে- ''কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।" কিন্তু সংশয় হলো আসক্তির বসে মানুষ কর্ম করে এবং কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে ফলে ভোগবাসনা নিবৃত্তির পরিবর্তে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কর্ম সম্বন্ধে এই সংশয় দূর করতে গিয়ে ঈশোপনিষদ শিক্ষা দিয়ে বলেছে যে- ''এবং ত্বয়ি নান্যথেতো অস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।"

শাস্ত্রবিহিত কর্ম ছাড়া ভোগবাসনা ত্যাগের আর অন্য কোন পথ নেই। আবার যারা আত্মজ্ঞান বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, পার্থিব জীবনের প্রাপ্তিকে চরম প্রাপ্তি বলে মনে করে সে সব আত্মজ্ঞানহীনদের শিক্ষা দিতে গিয়ে এই উপনিষদ বলেছে যে মৃত্যুর পর এসব লোকেরা নিরন্তন জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে এদের দুঃখ ভোগের কখনো নিবৃত্ত হয় না। অর্থাৎ শুধু কর্ম মার্গ আশ্রয়ের ফল হয় গহন অন্ধকাররূপ ঘোরতর সংসার বন্ধনদশা এবং কর্ম কে বাদ দিয়ে শুধু জ্ঞানমার্গ আশ্রয়ের ফল হয় ততোধিক ঘোরতর সংসার বন্ধনদশা।

ঈশোপনিষদ মূল লক্ষ্য

এভাবে পৃথক পৃথকভাবে কর্ম ও জ্ঞানের শিক্ষা দিয়ে ঈশোপনিষদ মূল লক্ষ্য লাভের আশ্রয়রূপে এই উভয় মার্গের সহানুষ্ঠানের শিক্ষা দিয়ে বলেছে।

ঈশোপনিষদ-এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়

সুতরাং উপনিষদ এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ব্রহ্ম জ্ঞান। ঈশোপনিষদ অতি সংক্ষেপে অথচ গুরুত্ব সহকারে এই ব্রহ্ম জ্ঞান লাভের উপায় সমূহের শিক্ষা দিয়েছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এক এবং বহু,কর্ম ও জ্ঞান, বিদ্যা ও অবিদ্যা, সম্ভূতি এবং অসম্ভূতি প্রভৃতি আপাত বিরুদ্ধ বিষয় সমূহেরও শিক্ষা দিয়ে বৈদান্তিক সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে নিয়েছে।

ঈশোপনিষদে বর্ণিত অদ্বৈতবাদ ও আস্তিক্যবাদ

ঈশোপনিষদ্ তার ১ম স্তোত্রটিতে 'ঈশ' শব্দটির একক উল্লেখের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই শব্দটি অন্যান্য মন্ত্রে পুনরায় উল্লিখিত হয়নি। একটি ব্যাখ্যা অনুসারে, 'ঈশ' শব্দটি অদ্বৈতবাদের দ্যোতক। অন্য একটি ব্যাখ্যা অনুসারে, এটি একেশ্বরবাদের একটি রূপের দ্যোতক। সেই হিসেবে প্রথম মতানুসারে 'আত্মা' এবং দ্বিতীয় মতানুসারে 'পরম দেবতা'।

''ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগৎত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।।"

ব্রহ্মান্ডে যা কিছু অনিত্য বস্তু আছে, এ সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আবরণীয়। উত্তমরূপ ত্যাগের দ্বারা (আত্মাকে) পালন কর। কাহারও ধনে লোভ করিও না। অথবা-(ধনের) আকাঙ্ক্ষা করিও না, (কারণ) ধন আবার কাহার ?

'সর্বম্' কথাটির মাধ্যমে অভিজ্ঞতাপ্রসূত সত্য। 'ত্যক্তেন' শব্দটির মাধ্যমে সন্ন্যাসের ভারতীয় ধারণাটিকে বোঝায়। 'ভুঞ্জীথা' বলতে বোঝায় 'আত্মোপলব্ধির আনন্দ'।

অদ্বৈত বেদান্ত প্রবক্তা আদি শঙ্কর' ১ম মন্ত্রের 'ঈশ' শব্দটির অর্থ করেছেন 'আত্মা'। অন্যদিকে দ্বৈত বেদান্ত প্রবক্তা মধ্ব এই শব্দটির অর্থ করেছেন বিষ্ণু। এই বিষয়ে অন্যান্য মতও আছে। যেমন, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের পন্ডিত মহীধর বলেছেন, ১ম মন্ত্রটি বুদ্ধের কথা বলেছে। তবে ম্যাক্স মুলারের মতে, এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। হিন্দুধর্মে 'আত্মার' অস্তিত্ব স্বীকৃত। অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মে তা স্বীকার করা হয় না।

কর্ম এবং আত্মানুসন্ধান

ঈশোপনিষদ্ গ্রন্থের ২য় থেকে ৬ষ্ঠ মন্ত্রে হিন্দুধর্মের দুটি পরস্পর-বিরোধী সংকটের অবতারণা করা হয়েছে। এই সংকট গৃহস্থের ব্যবহারিক জীবন ও কর্ম এবং ত্যাগ।

"কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোহস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।।
অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।।
অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোহন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি।।
তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরেতদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।।
যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজগুপ্সতে।।" [মন্ত্র-২-৬]

যে ব্যক্তি এই জগতে শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে উৎসুক, তিনি (শাস্ত্র-বিহিত) কর্ম করিয়াই বাঁচিতে ইচ্ছা করিবেন। এই প্রকার (আয়ুষ্কামীও) নরাভিমানী তোমার পক্ষে এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই যাহাতে তোমাতে (অশুভ) কর্ম লিপ্ত না হইতে পারে। অসুরদিগের আবাসভূত সেই সকল লোক দৃষ্টিপ্রতিরোধক অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছাদিত। যে সকল মানব আত্মঘাতী তাহারা সকলেই দেহত্যাগ করিয়া সেই-সকল লোকে গমন করে। (সেই আত্মতত্ত্ব) অচল, এক ও মন হইতেও অধিকতর বেগবান্। পূর্বগামী ইহাকে ইন্দ্রিয়েরা প্রাপ্ত হয় না। ইনি স্থির থাকিয়াও দ্রুতগামী অপর সকলকে অতিক্রম করিয়া যান। ইনি আছেন বলিয়াই বায়ু (অর্থাৎ সূত্রাত্মা) সর্বপ্রকার কর্ম আপনাতে ধারণ করেন। অথবা–সূত্রাত্মা সর্বপ্রকার কর্ম যথাযথ বিভাগ করিয়া দেন। ইনি চলেন, ইনি চলেন না; ইনি দূরে, আবার ইনি নিকটে; ইনি এই সমস্ত জগতের ভিতরে; আবার এই সমস্ত জগতের বাহিরে। কিন্তু যিনি সমুদয় বস্তুই আত্মাতে এবং সমুদয় বস্তুতেই আত্মাকে দেখেন, তিনি সেই দর্শনের বলেই কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

আদি শঙ্কর বলেছেন, ৬ষ্ঠ মন্ত্রের 'ইনি' বলতে বোঝানো হয়েছে "আত্মা ও নিজ আত্মা ও সকলের আত্মার একত্ব অনুসন্ধানের পথযাত্রী মুমুক্ষু। সন্ন্যাসও এর অন্তর্গত। অন্যদিকে মধ্ব মনে করেন,'ইনি' হলেন "ঈশ্বরের প্রেমে নিমগ্ন জীবাত্মা। এই আত্মা পরমাত্মার সান্নিধ্য কামনা করে।

বিদ্যা ও অবিদ্যার প্রতিপাদন

ঈশোপনিষদ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, দুঃখ ও কষ্টের অন্যতম মূল হল নিজ আত্মাকে অন্যের আত্মার থেকে পৃথক জ্ঞান করে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া। এই পৃথক জ্ঞান আসে অস্তিত্বের প্রকৃতিকে সংঘর্ষশীল দ্বৈতজ্ঞান করার থেকে। এই

জ্ঞানে একজনের আনন্দ ও বেদনা অন্যের আনন্দ ও বেদনার থেকে পৃথক মনে হয়। এই উপনিষদের মতে, যদি একজন ব্যক্তি সকল বস্তুতে আত্মাকে অনুভব করতে পারেন, তাহলে এই কষ্ট আর থাকে না। এই অদ্বৈত জ্ঞান থেকে তিনি বুঝতে পারেন সকল অস্তিত্বের মধ্যে একটি একত্ব রয়েছে। তখন তিনি ব্যক্তিগত অহংবোধের ঊর্ধ্বে উঠে যান এবং বিশ্বজনীন মূল্যবোধ, আত্মা ও প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধানে লিপ্ত হন।

''যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।।'' [মন্ত্র-৭]

সমুদয় বস্তু যে কালে জ্ঞানীর আত্মাই হইয়া গেল, তখন সেই একত্বদর্শীর মোহই বা কি, আর শোকই বা কি? অথবা-জ্ঞানীর যে আত্মা সমুদয় বস্তু আত্মরূপে এক হইয়া গেল, সেই একত্বদর্শীর আত্মায় মোহই বা কি, আর শোকই বা কি?

ঈশোপনিষদ্ গ্রন্থের ৮ম থেকে ১১শ মন্ত্রের বিদ্যা (প্রকৃত জ্ঞান, চিরন্তন সত্য) অনুসন্ধানের প্রশংসা করা হয়েছে। এই গ্রন্থ অনুসারে, যিনি 'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা'কে জানতে পারেন,'অবিদ্যা' তাকে মৃত্যু অতিক্রম করতে সাহায্য করে (তিনি জীবিত থাকেন) এবং বিদ্যা তাকে অমরত্ব দান করে। সত্য জ্ঞান তাকে সকল দুঃখ ও ভয় থেকে মুক্তিই দান করেন এবং তিনি জীবনে আনন্দ পান। গ্রন্থের ১২শ থেকে ১৪শ মন্ত্রে কোনোকিছুর শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ কারণ বা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক কারণ অনুসন্ধান সম্পর্কে সতর্ক করে বলা হয়েছে, এই ধরনের একদেশদর্শী অনুসন্ধান অজ্ঞানতার অন্ধকারে ঠেলে দেয়। জ্ঞান অর্জনের জন্য উভয়ের অনুসন্ধানই কাম্য। এই উপনিষদে বলা হয়েছে, যিনি সত্য ও নশ্বর এবং প্রত্যক্ষ অসত্য কারণ ও গুপ্ত সত্য কারণ উভয়কেই জানেন, তিনি মুক্ত হয়ে অমরত্ব লাভ করেন।

পুণ্য ও পাপের বর্ণনা

ঈশোপনিষদ্ গ্রন্থের শেষ ১৫শ থেকে ১৮শ স্তোত্রে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে জ্ঞান আলোকের সুবর্ণ চাকতির পিছনে লুক্কায়িত থাকে। তবে এই আলোক ব্যক্তিকে খুঁজে নিতে হয়। এই জ্ঞান মানব মনকে তার কৃতকর্মের কথা এবং সেই কৃতকর্মের প্রারব্ধের কথা মনে করিয়ে দেয়। মাধ্যন্দিন ও কান্ব শাখাদুটিতে এই মন্ত্রগুলির বিন্যাসে কিছু পার্থক্য আছে। তবে উভয় শাখাতেই একই অনুধ্যান উল্লিখিত হয়েছে, "হে অগ্নি ও মন, আমাকে পবিত্র জীবনের দিকে নিয়ে যাও। আমাকে পাপের জীবন থেকে দূরে যাওয়ার পথ বলে দাও।" এইভাবে সৎ পথ ও ধন উপভোগের পন্থা (কর্মের মধু ও আত্মা-অনুসন্ধান) বলা হয়েছে। শেষ স্তোত্রে মৌলিক ধারণা "আমিই সেই" উল্লিখিত হয়েছে। এই ধারণায় ব্যক্তি আত্মাকে বিশ্বাত্মার সঙ্গে একীভূত করা হয়েছে-**"যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।"**

Peace comes from within, donot seek it without.
- The Buddha

❒ **Travel**

FEW NATURAL BEAUTIES OF TARAI-DOOARS BELT

Prof. Biswajit Talukdar

"Nature is the art of God"

If you are the type who loves going to offbeat locations then some places in West Bengal you would definitely like to visit. Going to less crowded locations in West Bengal is a great way to have fun and adventure filled holiday and to explore places that lie off the beaten path. So today I have listed the offbeat places of Tarai-DooarsBelt that you will really love to visit.

Kolakham:

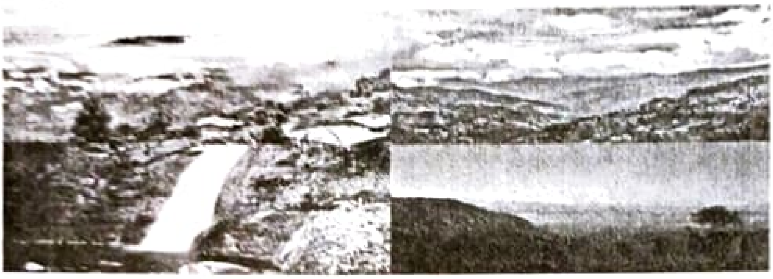

A paradise for bird lovers and adventure seeking tourists, located an altitude of 1868 m in the Kalimpong Hills of Darjeeling Dist, on the fringe of Neora Valley National Park, just 108 km from Siliguri via Kalimpong amidst the clouds, surroundings and facing the Majestic Mount Kanchenjunga can be seen atop the lush green valleys. One can enjoy the beautiful range of snow peaks, the never-ending green forest and variety of birds from this place. Enthusiasts can go for a walk on the jungle trail. The chance of coming across wildlife is quite higher here. A trek of 5 km will take to the beautiful Changey falls.

Samsing:

Where small streams, natural forests, tea gardens come together to form a breath-taking landscape is place called Samsing. It lies 18 km from the Neora Valley National Park. One of the places where many tourists stay overnight is Suntalekhola which is about four kms further up the road from Samsing where the road ends close to a small stream named on the place itself in the village of Faribasti. Flower gardens give this place amazing view, is common to almost all households and some households may allow home stay for tourists. `Rocky Island nature resort` on the banks of river Murti is another attractive tourist spot that lies 2 km from Samsing. Treks and accommodation are arranged in small Tents for overnight visitors in the surrounding area of the National Park. There is `Tree Fern Point` and `Mo` or `Mo Chaki` for a great view of the Himalayas in one side and the plains of Dooars in the other where Trekkers can take ride. Bhutan hills and Jelepla, the pass which connects Tibet with India, is also notable place to visit. Other places nearby are malbazar, chalsaandmeteli.

Sillery Gaon:

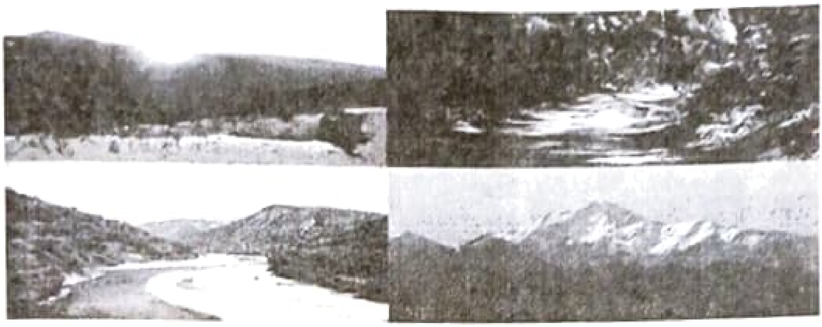

Sillery Gaon, a small village surrounded on all sides by tall pine trees, at a height of about 6000 ft in the Darjeeling district. Located at a distance of around 8 km from Pedong and 5 km from 21 Miles, this sleepy village of New Darjeeling offers a magnificent view of the Kanchendzonga. The shimmering silver peak and the serenity around entice every traveler visiting the village.

Takdah:

It is a small hamlet, a treasure secret, because it's yet to develop as a fully-fledged tourism place. Takdah is located at an altitude of about 4,000 ft and about 28kms from Darjeeling, yet far enough to be isolated, quiet and serene.

The original name was pronounced as 'Tukdah', which is a Lepcha word meaning mist or fog. And the name is aptly given as the place often remains covered with fog. So what can you expect? Misty meandering roads, chirping of the birds, nature trails passing through dense forests, sound and sight of fountain streams coming down the slope of mountains every few yards you walk - this is what Takdah is.

Lamahatta:

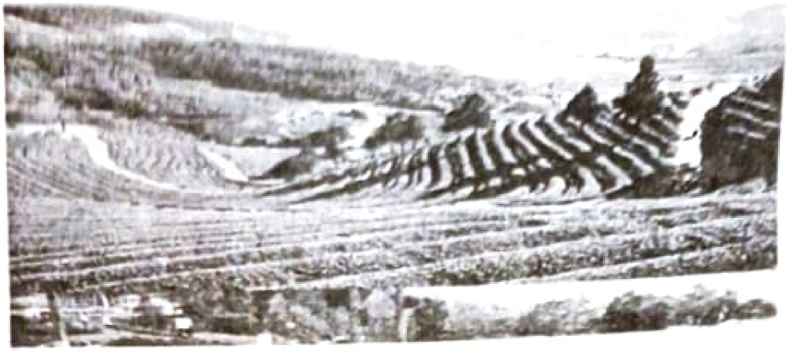

Lama in Lamahatta stands for Buddhist monk and Hatta for hut - a monk's hermitage. Lamahatta is located at an altitude of about 5,700 feet and at a distance of 23kms from Darjeeling hill. It's a small village where farming and cattle rearing are the main sources of livelihood.

It is a mountain village with vast stretching forests of dhupi& pines, vast stretch of beautiful manicured roadside garden and the magnificent views of the peaks and rivers around.

Tinchuley:

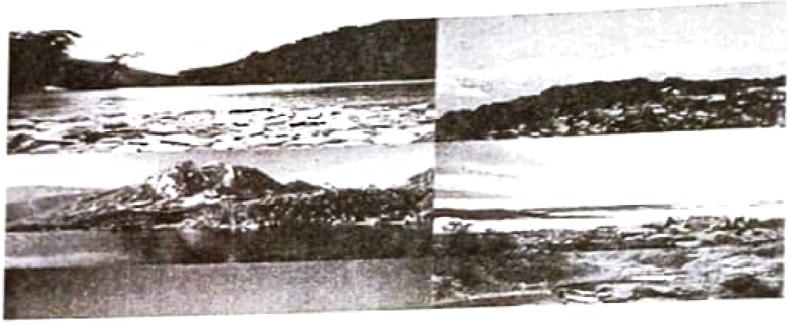

Tinchuley is a small mountain village (rather a hamlet) in Darjeeling district and located at an altitude of 5,800ft, and just 3kms above Takdah. The word Tinchuley means Three Ovens (i.e. Tin Chullahs). And such name to the village has been given because of the three prominent hill tops that surround the place and which from far look like ovens or chullahs. Tinchuley faces the **Kalimpong hills.**

If you love nature, the lovely views of the Himalayan range, like to see the meandering Teesta flow through the mountain landscapes, enjoy tea gardens, orange orchards, walking along village trails, watching birds, local culture, people and food, then this is the right place for you.

Latpanchar:

It's a beautiful mountain hamlet offering stunning views including that of Kanchenjunga, having wide range of bird & animal life as well as many different types of amazing plantations.

Latpanchar actually forms the highest part of Mahananda Wildlife Sanctuary with an average altitude of about 4,200 ft and about 44 kms from New Jalpaiguri. Since it's part of the sanctuary, there is good chance that you will come across some wildlife here like deer, barking deer, wild boars, and sometimes even leopards and elephants while exploring the jungles around.

Srikhola:

A beautiful village at the foothill of Singalila National Park and having a mountain stream passing through it. A paradise for the nature lovers.

You can walk through the forest of birch, oaks and pine trees and enjoy the atmosphere. There is a river with the same name. Do fishing in the river; there are lots of trout fish.

Jorpokhri:

Jorpokhri is a tiny place on a hilltop and about 19 kms from Darjeeling town. Located at an altitude of 7,400 ft, the main feature of Jorpokhi is its twin lakes after which the place has been named. 'Jor' means two and 'pokhri' stands for a lake or water tank. You can often see large number of white swans swimming in the waters or strolling around in the nearby area. Jorpokhri, however is not only about the lakes. There is a lovely forest around full of dhupi and pines.In the water tanks you might be able to see the rare Himalayan Salamanders that are small lizard like amphibians. One of the best offerings of Jorpokhri is its sweeping views of the Himalayan snow peaks and the Darjeeling landscape. On a clear day and from one side of the lake you can get breathtaking views of the majestic Kanchenjunga peaks. On the other side you can see Darjeeling and Kurseong town landscapes.

❐ প্রবন্ধ

ভাষা-আন্দোলনে প্রতিবাদী নারীকণ্ঠ

ড. সুমিতকুমার মন্ডল

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল ২১-এর ভাষা আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার মধ্য দিয়ে। জীবনপ্রবাহে অঙ্গীভূত হয়ে সে আন্দোলন বাংলাদেশের মানুষের শিরা-উপশিরায় মিশে গিয়েছিল। আবেগমথিত জনসাধারণ নাগরিক সভ্যতার আত্মমুখী গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে 'আন্দোলন 'কে উচ্চারণ করেছিল অন্য এক মাত্রায়, ভিন্নধর্মী উল্লাসে। সেখানে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকাও অনন্যতা লাভ করেছিল। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে নারীর অবদানের স্বীকৃতি মেলেনি তেমনভাবে। অথচ ভাষা-আন্দোলনের শুরু থেকেই নারী জড়িত ছিল ওতপ্রোতভাবে। তবু পুরুষের ভূমিকার মতো নারীর ভূমিকা দৃশ্যমান নয়। আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের স্বীকৃতির যে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সূচিত হয়েছে তাতে নারীরা যেন ব্রাত্যই থেকে গেছে।

স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সোপান ভাষা আন্দোলন। এটি নারীজাতির কোনো বিচ্ছিন্ন আন্দোলন নয়। ভাষা-আন্দোলনে যোগ দিয়ে নারী তার অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করতেও শিখেছে। সমকালীন সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে নারী যে সাহসী ভূমিকা রেখেছিল, তা যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে ভাষা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। এই আন্দোলনের পথ তৈরি হয়েছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্র ধরে। বিশ শতকের ত্রিশের দশকে পূর্ব বাংলায় বৈপ্লবিক সশস্ত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন লীলা নাগ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত প্রমুখ। স্বাধীনতা আন্দোলনের চারটি ধারায় নারীরা অংশগ্রহণ করে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বৈপ্লবিক সশস্ত্র ধারা, অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ধারা, স্বদেশি আন্দোলনের ধারা ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা– এই চারটি ধারায় নারীরা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে আশালতা সেন ব্যাপকভাবে নারীসমাজকে সংগঠিত করেন। সেই সময় রাজনৈতিক কর্মকান্ডে, স্বাধীনতা আন্দোলনে নারী সমাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন জাবেদা খাতুন চৌধুরানী, নেলী সেনগুপ্ত, দৌলতুন্নেসা প্রমুখ।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জিয়াউদ্দিন আহমেদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। জিয়াউদ্দিন আহমেদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ। ১৯৪৭-এর ২৯ জুলাই 'আজাদ' পত্রিকায় 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি জানান যে, উর্দু পাকিস্তানের কোনো অঞ্চলেরই মাতৃভাষা নয়, তাহলে সেই ভাষা কীভাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে। ভাষা-আন্দোলনের সূচনা হয় সেখান থেকেই।

১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নিজামুদ্দিনের কাছে সিলেট জেলার নারীদের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। বশির আহ হেলাল-এর ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস গ্রন্থে এই বিষয়ে উল্লেখ আছে যে, '২২ শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা থেকে প্রেরিত সংবাদ অনুযায়ী পূর্ববঙ্গে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার দাবি জানিয়ে সিলেট জেলার মহিলাদের পক্ষ থেকে পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এতে স্বাক্ষর করেন মহিলা মুসলিম লিগের জেলা কমিটির সভানেত্রী জোবেদা খানম, সহকারী সভানেত্রী সৈয়দা শাহরেবানু চৌধুরী, সম্পাদিকা সৈয়দা লুৎফুন্নেসা খাতুন, রাবেয়া খাতুন, জাহানারা

মতিন, রোকেয়া বেগম, সামসী কাইসার, রশিদ নূরজাহান বেগম, সুস্মিতা খাতুন, মাহমুদা খাতুন, সামসুন্নেসা খাতুন ও অন্যান্য।' আনন্দবাজার পত্রিকায়ও এই সংক্রান্ত একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরটির শিরোনাম ছিল 'বাঙ্গলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী। পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রীর নিকট শ্রীহট্টের মহিলাদের স্মারকলিপি।' ঢাকা, ২২শে ফেব্রুয়ারি : (আনন্দবাজার পত্রিকা/২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮)।

১৯৪৮-এর ৫ মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকায় আরেকটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সেটি ছিল মুসলিম ছাত্রলিগের মহিলা সংগঠনের বিবৃতি। সংবাদটির শিরোনাম ছিল 'মুসলিম ছাত্রলীগের মহিলা সংগঠন সম্পাদিকার বিবৃতি।' সংবাদটি উদ্ধৃত করা হল–

'নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের মহিলা সংগঠন-সম্পাদিকা মিসেস রুকিয়া আনওয়ার একটি বিবৃতি প্রদান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান গণপরিষদে বাঙ্গালা ভাষাকে অস্বীকার করায় সমগ্র পূর্ববঙ্গ ব্যথিত হইয়াছে। পাকিস্তানে সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৬৯ জন বাঙ্গলা ভাষাভাষী এবং ইহা সাড়ে চার কোটি লোকের মাতৃভাষা। সংখ্যাগুরুর মাতৃভাষার পরিবর্তে বিদেশি ভাষা চালাইয়া দিয়া সংখ্যাগুরুর প্রতি যে অত্যাচার করা হইল ইতিহাসে ইহার নজির নাই।'

গণপরিষদে পূর্ববঙ্গের সদস্যগণ বাঙ্গলা ভাষার দাবি সমর্থন করেন নাই। ইহাতে আমাদের কাক ও ময়ূরের কাহিনি মনে পড়িতেছে। পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়। তিনি বলিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গের শতকরা ৯০ জন লোক উর্দুর সমর্থক। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে কেবল লজ্জার বিষয় নহে, পরন্তু ইহা অপমানজনক। পরিষদে মিসেস আনওয়ারা বলিয়াছেন, 'আমি পূর্ববঙ্গের মহিলাদের, বিশেষত ছাত্রীদের নিকট বাঙ্গলা ভাষাকে স্বীকার করিয়া লইবার জন্য আপোষবিহীন সংগ্রাম চালাইবার জন্য আবেদন জানাইতেছি।'

সিলেটের পিপি দেওয়ান আব্দুর রহিম চৌধুরীর স্ত্রী ছিলেন জোবেদা খাতুন। আদর্শবাদী এই সংগ্রামী মহিলা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের একজন অগ্রণী সৈনিক ছিলেন। সিলেটে তমদ্দুন মজলিসের কমিটি গঠন এবং সেই কমিটির পক্ষে গোবিন্দ পার্কে ৮ মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবসের জনসভা আয়োজন তারই উদ্যোগে হয়েছিল।

ভাষা-আন্দোলনকে সক্রিয় রূপ দেওয়ার জন্য একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৮-এর ২ মার্চ গঠিত এই সংগ্রাম পরিষদে দু'জন সদস্য ছিলেন নারী। তাঁরা হলেন, আনোয়ারা খাতুন এবং লিলি খাতুন। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের যে সব কমিটি গঠিত হয় তাদের দু'টি বৈঠক পরপর ৪ ও ৫ মার্চ বিকেল পাঁচটায় ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে ১১ মার্চের ধর্মঘট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই ধর্মঘটে সারাদেশেই নারীসমাজ সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। যশোর রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন আলমগীর সিদ্দিকী ও হামিদা রহমান। ১১ মার্চের হরতাল সম্পর্কে হামিদা রহমান লিখেছেন,'এইদিন সব স্কুল কলেজে হরতাল পালিত হয়। হরতালে যোগ দিল না মোমিন গার্লস স্কুল ও যশোর জেলা স্কুল। তখন যশোরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন নোমানী সাহেব। তার মেয়ে মোমিন গার্লস স্কুলে পড়তো। সে সক্রিয়ভাবে অন্য মেয়েদের ধর্মঘটে যোগ দিতে বাধা দিয়েছিল। আমরা শেষ পর্যন্ত মোমিন গার্লস স্কুলের মেয়েদের ধর্মঘটে যোগ দিতে বাধ্য করেছিলাম। এই ধর্মঘটের পর আমার নামে হুলিয়া জারি হয়। আমার আজও মনে আছে নোমানীর মেয়েকে জোরে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ির ওপর থেকে নীচে ফেলে দিয়েছিলাম।'

গ্রেফতার এড়ানো প্রসঙ্গে হামিদা রহমান লিখেছেন,'হোস্টেল থেকে কেশব একটা পাজামা, একটা শার্ট ও একটা গামছা এনে দিয়েছিল আমাকে। আমি শাড়ি বদলে পাজামা ও শার্ট পরে মাথায় গামছা বেঁধে একটা বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে কলেজের পিছনের দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। ঐ পোশাকে কেউ আমাকে সেদিন চিনতে পারেনি। এ রাস্তা ও রাস্তা অলিগলি হয়ে বাড়িতে রাত আটটায় গিয়ে পৌঁছলাম। ইতিমধ্যে অন্য ছেলেরা বাড়িতে এসে খবর দিয়ে গেছেন আমি যেন বাড়িতে না ঘুমাই। কেননা আমার নামে 'হুলিয়া' আছে। মায়ের

আদেশক্রমে সেই রাতে আমি পাশের বাড়ির দাদির কাছে ঘুমাই।'

সারা দেশের আন্দোলনে নানাভাবে নারীরা সংযুক্ত হয়েছেন। প্রায় প্রতিটি শহরেই আছড়ে পড়েছিল সংগ্রামের ঢেউ। বগুড়ার ধর্মঘটে যারা নেতৃত্বে ছিলেন তাদের মধ্যে দু'জন ছিলেন নারী। একজন রহিমা খাতুন, অন্যজন সালেহা খাতুন। সালেহা খাতুন ১৯৪৯-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও ছাত্রদের বহিষ্কারের প্রতিবাদে আহত হয়েও ধর্মঘটে অনড় থাকেন এবং পিকেটিংরত অবস্থায় গুন্ডাদের হাতে লাঞ্ছিত হন। এক সাক্ষাৎকারে বলেন, '১৯৪৯-এর ৩০ নভেম্বর নাদেরার ট্রায়াল হলো জেল রুল ভায়োলেশন বিষয়ে। জেল গেটে তার ট্রায়াল-এর সময় নাদেরা সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে জুতো ছুঁড়ে মারল। তারপর নাদেরার চুলের মুঠি ধরে ফটকে নিয়ে যাওয়ার সময় অন্য মেয়েরা বোতল, কাঁচের গ্লাস ইত্যাদি ছুঁড়ে মারতে শুরু করল। কারণ মেয়েদের ওয়ার্ডে জমাদার জেলার ছাড়া কোনো ওয়ার্ডার ঢুকতে পারে না। এরপর জেলের পাগলা ঘণ্টা দিয়ে সকলে মহিলা ওয়ার্ডে ঝাঁপিয়ে পড়লো।'

১১ মার্চ ধর্মঘটে ছাত্রীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। পুলিশ ছাত্রদের মতো ছাত্রীদের ওপরও অত্যাচার চালায়। আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য জুলুম চালায়। ১৫ মার্চ পরিষদে বিষয়টি নিয়ে তপ্ত আলোচনা শুরু হয়। মহিউদ্দিন আহমেদ পুলিশ অফিসার গফুরের বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে ছাত্রীদের ওপর কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ার প্রসঙ্গ তোলেন। বাদানুবাদের মধ্যে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েন সদস্য আনোয়ারা খাতুন। তিনি চিৎকার করে বলতে শুরু করেন, 'গত ১১ মার্চ তারিখে যা হয়েছে, তা হয়েছে। আজ পুলিশ মেয়েদের গায়ে হাত দিয়েছে, গলা টিপে ধরেছে, তার প্রতিকার চাই। ঐ সমস্ত চোরামী এখানে চলবে না। আমরা চাই, প্রধানমন্ত্রী সেখানে গিয়ে দেখে আসুন।' আরও একধাপ এগিয়ে মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'পুলিশ মেয়েদের গায়ে যখন হাত দিয়েছে তখন এই মুহূর্তে সকলের পদত্যাগ করা উচিত।'

১১ মার্চের ধর্মঘটের পর দেশব্যাপী আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। মাতৃভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরে বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক মনন ও স্বাধিকার চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। নারী সমাজকেও নাড়া দিয়েছিল ব্যাপকভাবে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার একটা বিশেষ দিক উন্মোচিত হয়েছিল এই আন্দোলনের মাধ্যমে। তৈরি হয়েছিল সচেতনতাবোধ। অনেক সামাজিক বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করার সাহস অর্জন করেছিল নারীসমাজ।

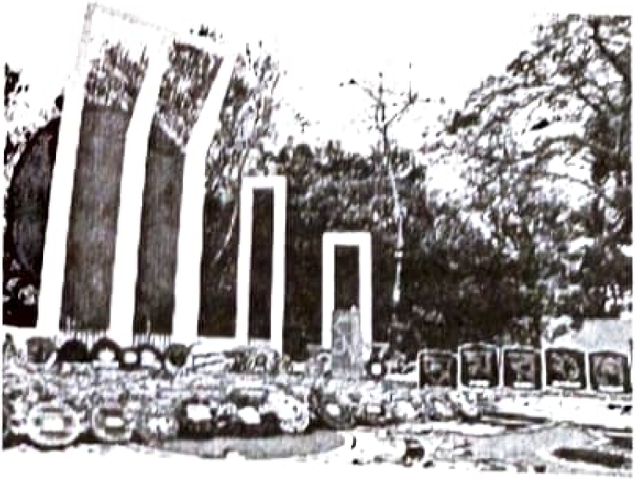

Fiction

Nirmalya

Sarbani Bera

Assistant Professor, Department of English

On a hot sunny day in July, we were summoned to the B.D.O's office for corrections in our voter identity cards, if any. It was only at the B.D.O's complex where I realized that there were actually many! The cue trailed from the B.D.O's office window across the wet fields up to the steps of the office pond where it took a sharp turn and reached for the Minority Welfare office building. The sight of so many people at such an early hour maddened me and I felt like giving it up altogether. It's better to live as my father and let him be my son for the rest of my life rather than tan myself into a boxer's punch bag there in the sun. But soon, I had the right frame of mind to go at least once through the cue in search of familiar faces. We all do it and we all know why. Holla! I found a bunch of them trailing not far from the B.D.O's window. I rushed into my friends and started with huge apologies for being late. 'Ohh, it was the traffic in the roads. There are so many cars , you know, during the office hours. You are bound to be late". My friends knew what was to be done in such circumstances and very soon, I was in. The disapproving eyes dared not interfere for it was given out that I was expected. A thin and cranky aunty would still inquire maliciously if we expected anyone more to which we hurriedly replied with a bland ``No" . That settled the issue.

Having got a place, I surveyed the scene. There were hundreds of them who had accumulated there so as to help the Govt with correcting their citizen's name. address, father's name etc in the voter id cards. I knew that this would take time as was usual with the Govt offices and had more or less made up my mind to be patient and resilient. The thought of having been privileged to wait less than what was due made me all the more complacent. My companions prodded to and fro the B.D.O's office window, waited there sometimes foolishly as if to find fault with the clerks 'proceedings and returned to their places with wry faces and expressions weird than before. I amused myself with my phone trying to feed my snake as big as to capture the whole screen but often failed and turned hither and tither to forget my lot. Whenever I failed, I looked up at the uneven crowd trying to find something particular that would interest me. Sometimes I too stared at the clerk's table seeing nothing and hearing nothing but staring incessantly as if the whole business of my life was to glare at others. The crowd made a jubilant show -there were women and children, young girls, girls with fathers and brothers holding umbrellas over them, there were men and young boys- all clad in multiple hues. I particularly sighted a girl wearing a blue salwar with jingling bells tied to her apron. The girl was lush black with dark eyes overbowed by a pair of knitted eyebrows. She wore her hair in a bun on the top of her head that swayed side ways like the hood of a snake. The girl sulked often and twisted her lips to eek off her frustrations perhaps and I liked the curves of her body. It was one ripple of the waves. I eyed her once or twice but she rolled her eyes away from me. She continued to wipe her face and fan herself with her apron which let out a joyous jingle every time she reached for them. Presently, I saw the B.D.O's peon come up and hand out coupons to the next twenty in the cue. He collected the id cards from them and went inside. The crowd jostled and clamoured for the peon but was soon peaceful. I waited my turn . There were at least another fifty of them waiting before me. Another fifty might be lurking anywhere between us- resting perhaps while others kept their count. They would burst into the cue at the most opportune moment. I had to be patient. I kept up with the game and also stole glances at the girl. Every time I turned up from my game, I searched for her and noted her place in the cue. Her lips curled in interesting ways- and I could read the entire alphabet in them- sometimes a small but pretty U , sometimes a long drawn O, and sometimes a twisted G. I continued to read her lips when I heard the peon call out names -'Balbulu Sardar…son of Murthy Sardar'. While the crowd chuckled inquisitive glances hither and thither, a man from the crowd broke past the jostling crowd and hissed angrily at the Peon

"That's not my name, idiot! You people make Bablu , Balbulu and make fun of people in front of crowds. You forget, I come here for the correction."

At this the crowd broke into a suppressed laughter. These are very common errors that govt officials make; in fact, they are so common that the masses have long forgotten to be offended and still feel obliged to come and wait in cues in the sun for correcting mistakes that they have never committed. The second was a Nityananda Modak who said that the electorate office had blessed him with the surname of his wife. He was come to keep the good name of his forefathers intact. The third was a Dutta Bishakha. I heard the peon call out the names and watched the people go in with great interest. I always felt that names have a bearing on a person's general looks and character. I could never believe that people with names like 'Kebla' or 'Hebla' would ever be intelligent. They seemed duds by their very names. And so when a pregnant cumbersome uncle went in, I wondered how he could be anyone but

Hriju Dutta. Oh! He should have been called some other names, say…say ….I wondered what he should be called when I heard another name- 'Nirmalya Banik'. Like a darted deer, I glared at an old man of about 65 reaching for the office window. I stared at the lean shrivelled face of this old man in utter disapproval. He cannot be Nirmalya; he can never be!

Nirmalya, this very name is a symphony and its every note a music. Nobody can ever be Nirmalya…no, no body. We were in class VIII then. Like a blind man exposed to sight, all things appeared so mysteriously beautiful and charming! It was the beginning of all things new.. it was a phase of knowing oneself, of carving one's identity, of loving and caressing one's inmate thoughts. A gust of sweet breeze that lashed my hairs against my face would tickle me to smile and I would laugh out aloud as if in proud admiration of myself. A thorn in the bush, a pebble by the stream, the gnawing smell of wild leaves trampled under feet, or even the call of a distant bird.. anything would be enough to run a sensational finger across my nerves and I couldn't but respond to them with a naïve wilderness. Yes, that was the beginning of dreams and romance, and foremost among these was a longing for the unknown, a cosmopolitan love for all things around us. And so, it was quite common that we all had penfriends; it was a means of exploring the unknown, of connecting one's inner self with the outer. More than anything, it was a matter of excitement, of fun and accomplishment. It satisfied our adolescent pride of being someone important to someone but then, it was also a lying contest altogether. The fact of distance and the absence of a 4G network equipped us with enormous opportunities of lying about ourselves, at least for me. There was a man of twenty five to whose friend request I promptly posed as one without any brother and thus, enjoyed the warmth and sunshine of a loving and caring brother for some time although he and all his brotherly concerns seemed no more than disdainful unwanted sentiments. I couldn't, however, carry on for long since I love my own brother and wouldn't have negated his presence or traded his love, no, not for anything in this world. And moreover, he threatened me with impending proposals of visiting my place, leave alone thoughts of being discovered someday. I ate up my fingers in earnest and stopped writing to him altogether. Nevertheless, I had a bunch of other pen-friends including Mimi. Neetu had someone named Amit and almost everyone had one or more. Our days started with beautiful letters writ in coloured paper , all full of pics and stickers and all throughout the day, letters were a constant preoccupation between classes. There wasn't a time in my life when I loved the scent of paper more than what I did then.

Days were running smoothly until one day Kavita chanced upon a young soul named Nirmalya. This person was a born poet who could make poetry out of anything.

In fact, he wrote with such ease and grace that we all became an ardent admirer of his brilliance. I wrote a bit of poetry too but compared to his poems, my limericks seemed a ragged corpse that went a-begging. So beautiful were his lines, so sincere his feelings! We waited eagerly for his letters and very soon, he became a phenomenon at school. We too developed a trend for shayaris and gazals. Books were bought and shared and digged in all night for exquisite phrases and expressions that would best befit the budding sensations in our young hearts. Songs were translated into English, excerpts were copied and notes were made in advance. Newspaper cuttings, drawings, even advertisement pages and taglines were collected and kept in store. Kavita was mad of him and so were we. Nirmalya was not hers alone. He was as much a part of our being as was Kavita's for he stirred our innermost thoughts with longings for a stranger unknown. He was our first tangible perception of a soul mate and we all speculated how he would be - Whether he would flaunt a beard like poets, whether he would be wearing specs, or, whether he would be tall , fair and handsome like the princes of our childhood tales. Nirmalya would now appear like this and like that at the very next instant. Like an airy form without shape or size, he would tantalise us with his very palpable presence. It's strange how he could reach us only through our senses. In the dark alleys, he would wait all by himself to chance upon us and whisper words of love into our ears. With every puff of breeze, with every move of leaves, he would call our names in soft tunes. Oh! How we loved him.

And then, after long intervening days, came the appointed hour. Kavita was to meet Nirmalya, her prince. We haven't been so busy in our life time. We all saved money for buying gifts and other knick-knacks. Everyone had something to present to Nirmalya or contribute in some way to this grand event in our lives. It was a dream come true for us. Someone offered Kavita, her fairy gown that she received on her previous birthday and one of my friends offered to accompany her to Sealdah from where she was to take a train to Kalyani. How fast time moved while these preparations were going on. On a Thursday, our Cleopatra set sail for her anointed prince. All throughout the day, I knew no patience. I was visualising events as if in anticipation.

" What would Nirmalya say to Kavita? Would he propose her? No, he might not for this is only the first of the several visits he is going to pay. Going through his letters it appears that he is a good guy. He might take time."

Thoughts and counter thoughts ran amok and wild across my mind as it suddenly stopped to wonder- "What if he does propose to Kavita? Would he kiss Kavita?"

The thought of Kavita locked in the arms of her Nirmalya and her lips trembling below his made me giddy.

"Ohh It's a nasty thought!"

I swallowed my blush lest anyone sees me through. The next day, I woke up at 5:30 and couldn't wait to go to school. My mother hadn't a word to complain of me as I hurried out of my house running almost all the way to school but when I reached there, I saw that my friends were more agile than I was. They were all waiting for Kaivta. The school gate closed at 8:30 without Kavita and that was perhaps the most tedious day I spent at school. Every period seemed long and dull and moreover, we couldn't escape the anxious unrest lurking in our hearts. The intervening Saturday and Sunday would be hard to bear. We almost ran to Kavita's house as soon as we were out of the school gate. We saw her mother from a distance scrubbing a kadhai hard on ground with ashes and detergent gone black from the soot oozing out in streams. We asked for Kavita almost altogether in a loud chorus. Her mother, much surprised at our tempestuous clamourings, asked in earnest if anything was amiss. She was doubtful whether the teachers were angry with Kavita for any of her mistakes. To this, one of my friends promptly lied that there was to be a surprise test to be held next Monday and that we were all there to inform her so. Some moments passed in impatient silence and then I asked slowly

"Aunty, isn't Kavita home?"

Her mother lifted up her face to say- "She will be home by today. She had been to Kalyani to meet a friend. From there she has gone to her aunt's. You know, her aunt lives nearby."

We gasped in bottled excitement.

"Did she meet her friend?"

- I asked with my breath trapped between my teeth. Her mother continued without lifting her face-

"Oh Yes! She did."

With an air of pride, she washed off the cauldron to throw out a stream of black froth and continued-

"How rich they are! How splendid! You know, Nirmalya had come in a red car. Oh how fair! How beautiful! Almost as white as milk! She looked almost like a princess! She wanted to take Kavita to her house…."

The rest of her words seemed lost in silence. I could hear no more. I could only stare at the heads of the black stream scrambling for way among my feet.

❒ **প্রবন্ধ**

যুদ্ধ ও বিশ্বমানবতাবাদ

অমিত কোলে

সহকারি অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

মানব ইতিহাসে যুদ্ধ এবং হিংসা পুন:সংগঠনশীল এবং অনিবার্য ঘটনা। যুদ্ধের ভয়াবহতা-কষ্টভোগ, নির্যাতন, গণহত্যা, মৃত্যু-সর্বদা এবং সর্বত্র পীড়াদায়ক। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যুদ্ধ কি জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ? সেই পুরাণ থেকে শুরু কিরে রামায়ণ-মহাভারতের মধ্য দিয়ে প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক যুগেও সেই যুদ্ধ আর যুদ্ধ। তার আর কোন বিরাম নেই। 'যুদ্ধ' শব্দটিকে এখানে খুব সাধারণ অর্থে প্রয়োগ করতে চাই। "War generally signifies a violent clash in which armed forces are employed"

গীতাতে লক্ষ্য করি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, "মামনুস্মর যুধ্য চ"(গীতা ৮/৭)(আমাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে স্মরণ করো ও যুদ্ধ করো)। গীতাতে আরও লক্ষ্য করা যায়- "অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্মং সংগ্রামং ন করিষ্যসি। অতঃ স্বধর্ম্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি' (গীতা ২/৩৩) অর্থাৎ (হে অর্জুন) যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না কর, তাহা হলে নিজের কীর্তি ও বর্নানুযায়ী কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হইবে। আবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।" (গীতা ৪/৮)

অর্থাৎ সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ন হই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এখানে ধর্ম বলতে শান্তিপূর্ণ প্রগতিশীল মানবধর্ম প্রতিষ্ঠার কথাই বলা হয়েছে। তাই দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যা আমরা গীতাতে লক্ষ্য করি। এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের অনিবার্যতার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া আধুনিক যুগেও আমরা শান্তির প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের যে আবশ্যিকতা রয়েছে তার স্বীকৃতিও পাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উল্লেখ করতে পারি। আমাদের আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, অথবা শান্তিপূর্ণ অবস্থানে অটল রাখার জন্য শেষ পর্যন্ত যুদ্ধকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করার পূর্বে বিবাদ, মীমাংসা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সনদের অনেক শান্তিপূর্ণ পথের ব্যবস্থাও আছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের মীমাংসার জন্য সনদের একটি অধ্যায়(Chapter VI Pacific Settlement of Disputes) আছে, এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে আলাপ-আলোচনা, অনুসন্ধান, আপস প্রচেষ্টা, মধ্যস্থতা, সালিসী এবং বিচারালয়, আঞ্চলিক সংগঠন বা অন্য কোন শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদ মীমাংসার কথা।

আর যদি শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের মীমাংসা না হয় তাহলে সনদের সপ্তম অধ্যায় এর প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী। এই অধ্যায়ে আমরা দেখি শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে রেলপথ, সমুদ্রপথ, বিমানপথ,ডাক সরবরাহ, টেলিগ্রাফ বা বেতার যোগাযোগ বন্ধ করতে, শুধু তাই নয়, এমনকি কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে (সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের) নির্দেশ দিতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এখনও পর্যন্ত সামরিক শক্তি ব্যবহার

করছে না। এর থেকে এটা স্পষ্ট যে, আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা, ন্যায়প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য আমাদের এই আন্তর্জাতিক সংগঠনটিকে যুদ্ধ করতেই হচ্ছে যদিও তার সনদের প্রস্তাবনায় যুদ্ধের নিগ্রহ থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বংশধরদের বাঁচাতে চাওয়া হয়েছে। (.....to save succeeding generations from the scourge of war…) এই ব্যাপারটা অনেকটা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতো। তাহলে প্রশ্ন হল- সত্যিই কি বেঁচে থাকবার জন্য শেষ পর্যন্তযুদ্ধই একমাত্র উপায়?কারণ সভ্যতার উষালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যুদ্ধ যেন মানব জীবনের একটি ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন- পৌরাণিক কালের দেবাসুরের যুদ্ধ, প্রাচীনকালের দেবাসুরের যুদ্ধ, প্রাচীন কালে রাজায় রাজায় যুদ্ধ, মধ্যযুগেরও রাজা বনাম রাজা, অথবা রাজা বনাম সামন্তদের যুদ্ধ অথবা আধুনিককালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, অতিসম্প্রতি ইরাক বনাম মার্কিন নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক দেশের যুদ্ধ, যা হয়তো পরবর্তী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্ম দিতেও পারে।এছাড়াও রয়েছে সাম্প্রতিককালের বিভিন্ন দেশের যুদ্ধ –যেমন আরব ইসরাইলের যুদ্ধ, ভিয়েতনাম কম্বোডিয়ার যুদ্ধ, চীন ভিয়েতনাম, চীন-ভারত,১৯৬৫ ও১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান, ইরাক-ইরান যুদ্ধ ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে বহু দেশের জাতীয় এলাকার মধ্যে গৃহযুদ্ধ। তাহলে এই পৃথিবীর মানব সমাজের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত আবহমানকাল ধরে যে যুদ্ধ চলেছে তার কি শেষ হবে না ? যুদ্ধে যে কত শত শত তাজা প্রাণ হারিয়ে যায় তার হিসেব কে রাখে ? তাদের রক্তের বিনিময়ে কি নতুন উন্নত ধরনের সমান সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে না ? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় –

...বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা ?

যুদ্ধের কি প্রয়োজনীয়তা আছে? উত্তর হবে আছে, আবার নাই। যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা আছে যেখানে ধরুন একটি জাতীয় অথবা গোষ্ঠী অথবা রাষ্ট্র অপর একটি জাতীয় বা গোষ্ঠী অথবা রাষ্ট্রকে বহুদিন ধরে শাসন ও শোষণ করে চলেছে সেখানে অন্যায় কে উচ্ছেদ করে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা আছে। আর এই আত্মরক্ষার্থে যে যুদ্ধ তাকে তো সমর্থন করতেই হবে। এর স্বীকৃতি আবার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ৫১ নম্বর ধারায় লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এই আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ হতে পারে কেবলমাত্র তখনই যদি আক্রমণের ঘটনা বাস্তবে ঘটে নতুবা নয়।

তাহলে একটা কথা পরিষ্কার যে দুটো উদ্দেশ্যে যুদ্ধ হতে পারে-(১)শোষণের উদ্দেশ্যে এবং (২)শোষনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ। শোষণের উদ্দেশ্যে যে যুদ্ধ তাকে আমরা যদি আক্রমনাত্মক যুদ্ধ বলি তাহলে দ্বিতীয় টি কে বলব 'আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ' আবার প্রথম থেকে যদি 'অন্যায় যুদ্ধ', দ্বিতীয়টিকে বলব 'ন্যায়যুদ্ধ'। তাঁহলে খুব যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলতে পারি, প্রথম যুদ্ধটি খুবই অপ্রয়োজনীয় আবার দ্বিতীয় যুদ্ধ খুবই প্রয়োজনীয় যেহেতু প্রতিরোধ করার একটা নৈতিক কারণ এখানে নিহিত। এখানে যুদ্ধকে দুর্বল পক্ষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই এই যুদ্ধ আত্মরক্ষামূলক এবং ন্যায় সংগত ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ এখানে অপরিহার্য ও বটে। যার প্রতিফলন আমরা মহাভারত যুদ্ধে পাই। কৌরব পক্ষের অন্যায়ের প্রতিরোধ ও শোষণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য এবং সর্বোপরি ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য পান্ডব পক্ষের মহাপরাক্রমশালী অর্জুনের যে যুদ্ধ তা শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, কাজেই আক্রমনারক্ষণামূলক যুদ্ধ না থাকলে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ আক্রান্ত হলেই কেবল মাত্র যুদ্ধ হতে পারে নতুবা নয়। আবার একটি কারণে যুদ্ধ হতে পারে যেমন যুদ্ধের মাধ্যমে পরাজিত করে অন্যায় শাসন এবং শোষণের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার বাস্তব সার্বভৌম শক্তির প্রয়াসের বিরুদ্ধে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ অথবা অনেক সময় শোষণ লাঞ্ছনা, হতাশা ও অপমানের হাত থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কাজেই আক্রান্ত না হলে এবং শোষিত

না হলে যুদ্ধের কোন প্রশ্নই ওঠেনা। এই যুদ্ধকে পৃথিবী থেকে দূর করতে হবে, না হলে মানব জাতি এবং তার সুদীর্ঘকাল ধরে তিলে তিলে গড়ে ওঠা মানবসভ্যতা যুদ্ধে ধ্বংসলীলায় লয় প্রাপ্ত হবে। সব রকমের শোষণ ও বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে একটানে ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সমাজ ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে প্রকৃত অর্থে শান্তি বিরাজ করবে।

একটু গভীরে চিন্তা করলে দেখা যায় যে আর্থিক বৈষম্য ও শোষণের পশ্চাদে লোভ, স্বার্থপরতা, বঞ্চনা, প্রতারণা, প্রভৃতির মত কুপ্রবৃত্তি গুগুলোকে প্রকৃত কারণ হিসেবে কাজ করে। এই ছবি গুলিকে মানুষের মন থেকে উচ্ছেদ করে তার পরিবর্তে কতগুলো ছবিতে ওগুলোকে সঞ্চারিত করে মানব হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত করতে পারলে যুদ্ধ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে বাধ্য। এই সু প্রবৃত্তিগুলো হল বিশ্বজনীন সৌভ্রাতৃত্ব বোধ, প্রেম-ভালোবাসা, পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা, সম্মান ও সহযোগিতা এর ফলে সৃষ্টি হবে বিশ্বমানব মনে প্রকৃত মানবতাবোধ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-স্ত্রী-পুরুষ ভৌগোলিক সীমারেখা নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে ভারতের যে তারা এই পৃথিবীর একই মানব গোষ্ঠীর সদস্য কাল্পনিক ধারণা মনে হলেও কথাগুলো কিন্তু একেবারেই প্রয়োজনীয়, বাস্তববোধ বিবর্জিত অথবা আদর্শের প্রলাপমাত্র নয়। না হলে বিশ্ব থেকে পারমানবিক যুগে সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের করুন বিদায় আসন্ন। তাই আজ চাই মানবিকতা, উদারতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ। বিবেকানন্দের হৃদয় বিকাশকারী শিক্ষা, শুধু তাই নয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে চিরন্তন শাশ্বত মূল্যবোধের বিকাশ ও তার সম্প্রসারণ তাহলে শান্তি ও ন্যায়ের বাস্তব বাতাবরণ সৃষ্টি হবে। না হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, 'শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস'। অর্থাৎ যুদ্ধ অপরিহার্যভাবে এবং অপরিবর্তনীয় ভাবেই দেখা দেবে যার অবশ্যম্ভাবী ফল হবে এই পারমাণবিক যুগে মনুষ্য কুলের সকলই অস্তিত্বের সম্পূর্ণ বিলোপ।চিরন্তন ও শাশ্বত মানবিক মূল্যবোধ ও নীতিবোধ সমন্বিত মানবসমাজে সার্থক শান্তির সহায়ক আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি, যার নাম ক্রিয়াবাদ। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যদি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক স্তরে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা যায় তাহলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ এড়ানো যাবে। কাজেই যুদ্ধকে জয় করবার একটা কার্যকর উপায় হচ্ছে পৃথিবীর সমগ্র মানব সমাজের ক্ষুধা-দারিদ্র্য রোগ-দুঃখ-হতাশা-ক্ষোভ-ঘৃণা-হিংসাকে দূর করার উদ্দেশ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে চাই বর্ধমান সামগ্রিক সহযোগিতা। সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্য এই প্রক্রিয়ায় প্রেরণা যোগাবে মানব জাতির ঐক্য। এর ফলে বিশ্ব মানবহৃদয়ে উদারতা বৃদ্ধি পাবে এবংএর ফলস্বরূপ মানবমনে তার মিথ্যা অহংকার, লোভ, দমন-পীড়ন এবং শোষণের নিষ্ঠুর মনোভাব জাগবে না। বছরের পর বছর আত্মঘাতী মারণ যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে পবিত্র, নিষ্কাম চিত্তে কয়েক ঘন্টার আলোচনার টেবিলে বসলে সব বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হতে পারে-অবশ্যই আলোচনার টেবিলে বসার আগে অহংবোধ, আমিত্ববোধ লুপ্ত করতে হবে, এবং কয়েকটি মৌলিক নীতি কে এখানে অনুসরণ করতে হবে। যেমন পারস্পরিক সহযোগিতা,স্বার্থত্যাগ ও দেওয়া-নেওয়ার মনোভাব ইত্যাদি। মিথ্যা অহংকার, সীমাহীন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার লোভের বশবর্তী হয়ে পারস্পরিক সংঘর্ষ যে কত অসার ও অবাস্তব এবং এর পরিণাম যে কত ভয়ানক তা তো ইতিহাসে প্রমাণ করে দেয়। এই পৃথিবীর শান্তিকামী সাধারণ মানুষের কাছে শান্তি একমাত্র কাম্য। তাই তারা যুদ্ধকে সবসময় ঘৃণা করেছেন। শান্তির খোঁজে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন। তাছাড়া সাধারণ মানুষ মূলত স্নেহপরায়ণ ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জীব। সমস্ত মানুষ কখনই আগ্রাসী হয়না।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একথা বলতে পারি যে, আজকের পারমাণবিক যুগে এই পৃথিবীর মানুষকে যুদ্ধ বন্ধ করার গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ যুদ্ধ কাউকে কখনো ক্ষমা করেনা। এর অর্থ যুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন আইন ও নীতিবোধের কোনো অস্তিত্বই থাকে না " When arms speak, law is silent.'

Essay

Mall Culture and Youths in India

Dr. Mahuya Roy Karmakar
Assistant Professor, Department of Political Science

Culture, as in the form of taste, art, manners, orientation shaped in a particular environment and favoured by social groups is one of the bases of any civilization. Time and again it has been changing its contents as and when the environment it is in that has been changing; in turn, social groups, accordingly, behave differently in different cultural settings. To support the statement renowned psychologist Lev Vygotsky can be referred who stated A mind cannot be independent of culture long back. Cultural attitudes of social groups are a vast arena to study; its content relates to different aspects, position, views or perspectives. It is worthy to study the 'culture' of any social groups in relation to its youths, being the future and structure of nation. This article will try to understand the relationship between a recently developed culture in India, i.e., the 'mall culture' and the 'youths' with some critical reflections, of course. The objective behind such study is to know to what directions the youth of the country is moving towards; does it have any effect on socialization; what are the worthiness of such aspiring cultures; if there is any negative economic implications of this on their future days. With this objectives in mind the article will try to establish its arguments on the basis of secondary sources of information collected through news articles, different blogs and websites.

Mall, the new avatar of traditional market places, is a merchantile establishment representing leading merchandisers and includes eateries, parking areas, entertainment houses and other means of leisure and amusement. Due to the policy of liberalization the merchantile establishment has bloomed to its best in urban areas of the country in recent times attracting the consumers with smart options of hangout, lucrative offers, digital payment methods, large product ranges help maintaining good and luxurious lifestyle. Not only this the malls become centre of attraction among peoples because of its consumer friendly nature with convenience in shopping, easy return policy often with no question as provided by many brands in retails and with wide range of choices with lower to higher price levels and like this. The shopping behavior of people in urban areas in general has been influenced a lot due to this increasing number of mall in the country providing its consumers a safe and secured environment for shopping and hangout and of course designed for people belonging different age groups. But researches and studies show it is the youths mostly who constitute the major part of the consumers or visitors of malls in the country; in other words, malls be the most favoured and local destination of youths in the country during festivities and in normal days as well.

Apart from being a place of commerce, malls are place to regenerate, revitalize, entertainment and of course socialization. The behaviour pattern among the youths in contemporary India is quite impacted by the newly developed mall cultures since the surrounding culture pattern can easily influence the minds and behavior of anyone. No-bargain policies, well mannered store persons and interactions among the peers of similar class and interest also contribute towards well socialization of visitors or consumers. With well-decorated eateries capable of giving mental stimulation for being in a joyful environment helps visitors to be relaxed and hangout with peers, colleagues and others. It is also observed that many events are being organized these days in the open spaces of malls to attract young age visitors towards different things like, educational and financial opportunities; official events sometimes taking place also in the specified places inside the malls. Youth also finds places of entertainment for their young kids when they come either for shopping or hangout; young kids thus enjoy the company of their peers contributing to their socialization in turn. In that way malls in contemporary in India, has been contributing towards the socialization of the youths very well; and such exposure often leading to the added amount of knowledge in various fields as well. During festivities irrespective of religion people are seen visiting and enjoying the delightful environment of malls in India.

The worthiness of mall culture is a matter of debate now. From the above discussion it is quite clear to us that it cannot be said completely unworthy to be a visitor or consumer of malls. But at times such aspiring cultures leave some negative impact too on the young generations; like, very young generation finds visiting and shopping at malls as status symbol where they bag most over valued branded items; it helps them show off that way. Spending excess times in those places sometimes make people contribute less to other important areas of life like, education, work, family and relatives, in turn, resulting in less growth in most areas and poor family relations. It really becomes difficult for average-income group parents to fulfill the increasing demands of their young kids for expensive items in the days of increasing GST and other taxes. It thus pinches the pockets of those parents and their savings too.

Another drawback is this growing culture has posed some challenges to small business persons of respective localities by lowering the sales of locally made products. Thereby, small businessmen continue to struggle and try to compete with the giant enterprises. Again, a division in the society could be seen between the lower and upper middle classes since the participation of people belonging lower middle class is much lower in terms of being consumer in malls than those upper middle classes. Such differences impact other social relations between these two classes also. Further, in recent times few stores in malls offer for sale of their products for marriages as combo in which they advertise for most items that are in practice to be given to brides during marriages, like household items and are legally known as dowry. Consumers are attracted more towards offers and price values rather than the degrading social values Thus, in the name of modernization people often move away from their own values and sometimes traditions or roots.

Growing mall culture has another adverse impact on the young generations of the country. The young generations with growing wealth has been the target of mall retailers mainly who are making every effort to satisfy their target group and the brand culture also contribute a lot in this process. Both cultures either ways affect the saving and spending habits of young generations. With higher standards of living, more wealth and spending power this particular generation often fails to understand their actual requirement level. They often spend more than their actual needs and of course, it touches high when it comes to brands again. The spending behavior of people is thus impacted a lot and it highly affects the saving behavior also in turn. It is obvious now that the higher spending and lower savings habit poses threat to their future life in a very dangerous way especially during the times of inflation.

In addition, during Covid-19 pandemic the shopping malls throughout the country got a harsh setback. Food, entertainment, retail shops remained shut down along with other segments in the country. It affected the lifestyle of the youths a lot during that time; it also impacted the psychological wellbeing of the mall consumers and visitors adversely especially the young people since hanging out at malls were restricted.

To wind up the above discussed issue it can be stated that malls being the centre of business, social interactions, cultural activities and entertainment has become one of the relaxed and popular ambience of the young generations of the country in recent times. Mall attributes easily succeeds in attracting the new young generations having more wealth and preferences for higher standards of living and brands. Actually, with the changes in time and arrival of modernization in all most every arena a difference in lifestyle, taste and attitude among the people could be observed. People are attracted more towards exchanging cultures. It is necessary it mention here that the development of such newly grown culture is the reflection of modernization, westernization and globalization but one thing has to be kept in mind in the Indian context is the economic growth rate of the country is yet to reach the growth rates of developed countries. Elseways, it might affect very adversely in near future the economic status of the contemporary young generations. However, it is mostly the youths of metros and developed cities who are attracted towards shopping malls more; there are still youths who not into such cultures who mostly belong to rural areas of the country. However, the changing patterns of behavior among the youths in terms of being consumer have both positive and negative implications for the country as a whole. In times of inflation the emphasis should be given more on using less imported items unless it is a very basic need; and here the youths can contribute towards the development of national economic growth by cutting down spending on imported branded items. To conclude, youths being the backbone the nations are expected to make a balanced position when it comes to development of any culture, here, the mall culture so that they must be capable of coping with any awful situation as it is not unknown to us about the implication of lockdown in times of Covid-19 pandemic on the shopping malls and youths being the consumers.

References:

Jeevitha. P. & Kanya Priya. R. (2019). A Study on Saving and Spending Habits of College Students with reference to Coimbatore City. International Journal of Research and Analytical Reviews, 6 (1), 463-466. Retrieved from http://ijrar.com/upload_issue/ijrar_issue_20543376.pdf

Puri, A. (2018, June, 24) The rise and growth of Indian Malls. Deccan Herald, Business, Retrieved from https://www.deccanherald.com/business/economy-business/rise-and-growth-indian-malls-676834.html

Bawa, R, Sinha, A.K., & Kant, R. (2019). Emerging Mall Culture and Shopping Behavior of Young Consumers.
Advances in Anthropology, 9, 125-150. Retrieved fromhttps://www.researchgate.net/publication/333846017_Emerging_Mall_Culture_and_Shopping_Behavior_of_Young_Consumers

---

Some are born great, some achieve greatness and some have greatness thurst upon them - **Shakespeare**

☐ কবিতা

নিজস্বতা

বৃষ্টি মন্ডল

শিক্ষিকা, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

ধন্যি আমি ধন্যি মেয়ে সত্যিই বড়ো আজব,
সবাইতো তাই আমায় নিয়ে করে অনেক গুজব।
রাস্তা ঘাটে চলতে গিয়ে শুনতে না হয় কতই কথা
সত্যি বলতে,ওসব কথা শুনে আমার লাগেনা আর ব্যথা।
সমাজতো বলবেই তাদের নিজের বক্তব্যতা
তাই বলেকি ছেড়ে দেবো নিজের স্বাধীনতা ?
যারা আজ তুলছে আঙুল আমার চরিত্রটায়
তারাইবা কি রয়েছে নিজের নিজস্বতায় ?
যারা আমায় দিয়েছে শুধু এক গুচ্ছ অপবাদ
তাদের বিরুদ্ধে করবো আমি আমার নিজের প্রতিবাদ।
সমাজতো বদলাইনি, রয়েছে ঠিক নিজের মতই
যেমন ছিলাম তেমন আছি থাকবো আমিও তেমনই।
মানবোনা হার,মানবোনা এই সমাজের বাধ্যকতায়
রইবো আমি আমার মতো নিজের নিজস্বতায়॥

সংকেত

সুপ্রভা দে কুন্ডু,

শিক্ষিকা, সংস্কৃত বিভাগ

চাতক পাখির ন্যায় বসে আছি
আসেনি সবুজ সংকেত এখনও,
হয়নি সন্ত্রাসবাদের অবসান।
নিয়মে বাঁধা দেওয়াল ঘড়িটায়
এখন আর দেওয়া হয়নি দম।
চারিদিক হতে কাতর চিৎকারে-
অধিকাংশ হয়েছে ম্রিয়মান।।
সবুজ সংকেত মেলার প্রতীক্ষা বৃথা,
ঘড়ি বাবু অসুস্থ
ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত
জীবনের প্রয়োজনীয়তা-
হারিয়ে ফেলেছে অসুস্থ পরিবেশ।
রক্ষণাবেক্ষনের অভাব
তাই চারিদিকে সন্ত্রাসবাদের জয়ডঙ্কা।

সত্যমেব জয়তে নানৃতম্.........

সত্যেরই জয় হয়, অসত্যের জয় হয় না

❒ প্রবন্ধ

রামায়ণ মহাভারতের সারসংকলন ও আমার কথা

তপন কুমার পন্ডিত

শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ

রাবণের লজ্জা ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিঃশেষ হয়ে গেছিল রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রের মানুষগুলি। রামায়ণে আমরা পাই রাম রাবণের মধ্যে যুদ্ধ অর্থাৎ শুভ শক্তির বিরুদ্ধে অশুভ শক্তির লড়াই। মহাভারতে পান্ডবদের সাথে কৌরবদের যুদ্ধ অর্থাৎ ধর্মের বিরুদ্ধে অধর্মের যুদ্ধ। পিতৃসত্য পালনের জন্য রামের ১৪বছর বনবাস এই কথা প্রমাণ করে পিতা পুত্রের মধ্যে নিবিড় ও মধুর সম্পর্ক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার এক অপূর্ব মেলবন্ধন। সিংহাসন পেয়েও সিংহাসনে না বসা ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম, মেজভাই লক্ষ্মণ রামের সহচররূপে বন গমন ও তাঁকে (রাম) বিভিন্ন কর্মকান্ডে সাহায্যদান, রাম সীতা উদ্ধারের কাহিনী তাঁর পত্নী প্রেমের পরিচয় ইত্যাদি ঘটনার কথা আমরা রামায়ণে পাই। প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কি হওয়া উচিৎ তা রামায়ণ না পড়লে বা না মানলে বোঝা অসম্ভব। আবার যা নেই ভারতে, তা আছে মহাভারতে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ বর্তমান সমাজের লজ্জার, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণের সঙ্গে এই বস্ত্র হরণের তুলনা চলে না। এটা ভগবানের লীলা। ভগবানকে পেতে হলে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ভগবানকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসলে এটা সম্ভব। পার্থিব জগৎ থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে নিজের মন, দেহ সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে হবে ভগবানের শ্রীচরণে। কাম, ক্রোধ, ভয়, লজ্জা, সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করতে শিখতে হবে। দুই হাত তুলে ভগবানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে। কিন্তু দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সভাকক্ষে– এটা চরম অপমানের, চরম লজ্জার। জনসভাকক্ষে তাঁর স্বামীদের উপস্থিতিতে বস্ত্রহরণ বর্তমান সমাজের এক চরম লজ্জার বিষয়, এর থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে যে, লজ্জা নিবারণ করতে শিখতে হয়। বস্ত্র পরিধান করলেই কি শুধু লজ্জা নিবারণ হয়? মনের লজ্জা নিবারণ করতে হয়, মনের যাবতীয় সংকোচ কুসংস্কার ও হতাশা দূর করে। কিন্তু উল্লেখ্য বিষয় এই যে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ এর সময় তাকে বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় দ্রৌপদী কাতর স্বরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ডেকেছিলেন। ভক্তের ডাকে ভগবান তখন সাড়া দিয়ে তাকে বস্ত্র দান করে লজ্জা নিবারণ করতে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু মহাভারতের দুর্যোধন, দুঃশাসনের মতো ব্যক্তিরা আজও বর্তমান সমাজে রয়েছে। তাদের কর্মকান্ডে বর্তমান সভ্যতার সম্মান ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। দ্রৌপদী বস্ত্র পেলেন এই কারণে যে আগের জন্মে দ্রৌপদী বস্ত্র দিয়ে ভগবানকে সাহায্য করেছিলেন। কথিত আছে এবং মহাভারতে সেটার উল্লেখও আছে। ভগবানকে যদি আমরা ভক্তি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে কিছু দিয়ে থাকি তাহলে নিশ্চয়ই সেই দেওয়া বিফলে যায়না। পাপ করলে তার শাস্তি পেতেই হবে জানবেন। কৌরবদের বিনাশ হয়েছিল তাদের পাপের জন্য, তাদের অধর্মের জন্য, আর পান্ডবদের জয় হয়েছিল তাদের পুণ্য ও ধর্মের জন্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের পক্ষেই ছিলেন, সর্বক্ষেত্রেই তিনি পান্ডবদের পক্ষে ছিলেন। ধর্ম রক্ষার্থে বা রক্ষার জন্য যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়েছিলেন। একটা কথা বহুল প্রচলিত ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কোনদিন মিথ্যা কথা বলেননি। অর্জুন ছিলেন নিজের লক্ষ্যে স্থির ও অবিচল। অপরদিকে দূর্যোধন, দুঃশাসনের প্রভূত ক্ষমতা থাকলেও শুধুমাত্র তাদের অন্যায় ও পাপ কর্মের জন্য তাদের বিনাশ হয়েছিল। ভীমের সঙ্গে গদাযুদ্ধে দুর্যোধন পরাজিত হয়েছিলেন। এ কথা আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে ক্ষমতা থাকলেই হয় না, এর জন্য চাই বুদ্ধি ও কৌশল। মানুষের ন্যায়-নীতি

বোধ, উপস্থিত ও বাস্তব বুদ্ধি। সততা মানুষকে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছে দিতে সাহায্য করে।

সব মানুষ জন্মগতভাবে যদি পশু হয় তবে তাকে মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হতে হলে তাকে পান্ডব হয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়ী হতে হবে। যে শ্রীকৃষ্ণ সভাকক্ষে দ্রৌপদীকে বাঁচাচ্ছেন সেই কৃষ্ণ হলেন যুগ নায়ক, পুরুষোত্তম। যিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে এই মানব সভ্যতাকে রক্ষা করছেন। একালে যুধিষ্ঠির হলেন মানবজাতির কাছে সত্যের প্রতীক, ভীম হলেন পৌরুষত্ব ও বীরত্বের প্রতীক, অর্জুন নিষ্ঠা ও শ্রমের প্রতীক, দুঃশাসন কামনা ও লাম্পট্যের প্রতীক। দুর্যোধন লোভ আর দম্ভের প্রতীক। আর শকুনি হল আমাদের কুটিলতা। মানুষের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, আশা-হতাশা, ধর্ম-অধর্ম সেই সবকিছুর চরিত্রায়নই হল মহাভারত। তাই প্রত্যেক মানুষের জীবনে এক আদর্শ গুরু দরকার, যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতো আমাদের পথ দেখাবে।

একটা কথা আমি পাঠক সমাজকে বলতে চাই শান্তিনিকেতনে থাকলেই গান শেখা যায় না, আবার দমদমে থাকলেও এরোপ্লেন চালানো শেখা যায় না। কোন কিছু শিক্ষার্জন করতে হলে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা দরকার। মনে রাখতে হবে ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়ার সুযোগ তুমি সব সময় পাবে না। জীবন ধর্মই আমাদের প্রতিযোগিতামূলক। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ.পি.জে. আবদুল কালাম প্রথম জীবনে খবরের কাগজ বিক্রি করতেন। কিন্তু নিষ্ঠা ও কর্মের জন্য তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলি প্রাচীনকালে জীবক বলে একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী রাজগৃহে তার অবস্থান ছিল। জীবকের বয়স যখন একুশ বছর তখন কঠিন রোগে আক্রান্ত মগধের রাজা বিম্বিসার। জীবক নানা ভেষজ মিশ্রণ কে যখন তৈরি করেছিলেন সেই মলমের জন্য রাজা বিম্বিসার আরোগ্য লাভ করলেন। সেই জীবকের হাতে পরবর্তীকালে চিকিৎসার জন্য অর্থ ভেসেছে স্রোতের মতো।তিনি নিজের ভোগের জন্য কিছুই রাখতেন না। কাতারে ধন-দৌলত বিলিয়ে দিয়েছেন আর্ত, পীড়িত মানুষের সাহায্যার্থে। জীবক ছিলেন একজন নির্লোভ ব্যক্তিত্ব, সৎ, উদারপরায়ন, বুদ্ধগত প্রাণ, মহামানব। আজকে এই লেখনীর মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করছি এই জন্য যে, এই মানুষ সারাজীবন নিজেকে পরার্থে নিয়োজিত করেছিলেন এই ছিল তার ধর্ম তার আদর্শ।

বর্তমান সমাজে শকুনির মতো চরিত্রের মানুষ প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। শকুনির পাশা খেলার শর্ত হিসেবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রেক্ষাপট শুরু হয়েছিল। কৌরবদের পক্ষে ছিলেন তাদের মামা শকুনি। তিনি কুবুদ্ধি দিয়ে পরোক্ষভাবে তাদেরই বিনাশ চেয়েছিলেন। কৌরবরা শকুনির চাল ধরতে পারেনি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে পান্ডবদের শত্রু ছিলেন শকুনি মামা, আসলে কিন্তু এটা নয় শকুনি ছিলেন খুবই ধুরন্ধর। তিনিও জানতেন পান্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ হলে কৌরবদের বিনাশ হবেই এই বিনাশ তিনি চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে হয়তো পূর্বজন্মের কোনো প্রতিশোধ তার কাজ করেছিল। তাহলে মানুষ চিনবো আমরা কেমন করে। শকুনি মামাকে কৌরব ও পান্ডবদের কেউ চিনতে পারেনি। যে খেলা শকুনি চেয়েছিলেন, সেই খেলার চাল কোন পক্ষই বুঝতে পারেন নি। আসলে শকুনি মামা ও পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এই দুইজনেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পান্ডবদের পক্ষে ছিলেন। আজ প্রতিটি সংসারের প্রতিটি পাড়ায়, প্রতিটি গ্রামে, শহরে, গঞ্জে, অলিতে-গলিতে শকুনির মতো কূটচক্রী লোক দেখতে পাবেন। তাদের সম্পর্কে আপনি সচেতন হোন, দূরত্ব বাড়িয়ে চলুন।

জন্ম হউক যথা তথা, কর্ম হউক ভালো। এক্ষেত্রে কর্ণের কথায় আসা যাক- কুন্তি যখন কুমারী ছিলেন তখন সূর্যদেবের বরে কর্ণের জন্ম। কর্ণের জন্ম নিয়ে অনেক রহস্য আছে তার আসল পিতা কে –এ প্রশ্ন আমাদের মধ্যেও আছে। জন্ম যেভাবে হোক না কর্ণের আপন পৌরুষবলে, আপন কর্ম বলে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে জয়ী হয়েছিলেন। কর্মের মধ্য দিয়ে তিনি নিজের জাত চিনিয়েছিলেন বর্তমান মানবসমাজকে। তিনি পঞ্চপান্ডবের দাদা হিসেবে পরবর্তীকালে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় পঞ্চপান্ডবের সাথে তার পরিচয় ঘটেছিল। ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য কর্ণ বড় বড় যোদ্ধারা কৌরবদের পক্ষে থাকলেও কৌরবদের

বিনাশ ঘটেছিল। কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছিল ধর্মের বিরুদ্ধে অধর্মের যুদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ অধর্মকে বিনাশ করার জন্য পান্ডবদের পক্ষ নিয়েছিলেন। ধর্মস্থাপনে তিনি বারেবারে আবির্ভূত হয়েছেন। এমনকি কলিযুগেও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে। এখানে কর্ণ হলেন আমাদের অভিমান ও পৌরুষত্বের প্রতীক। যুদ্ধের সময় কর্ণের রথের চাকা মাটিতে বসে গিয়েছিল। সেই সুযোগে আক্রমণের সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল শত্রুপক্ষ। এ কৃষ্ণেরই লীলা। এটা কর্ণের দুর্ভাগ্য। ভাগ্য তার সহায়ক ছিলনা। আমাদের এই মনুষ্য জীবনে কর্ণের মত অবস্থা হতে পারে, তবে নিজের চেষ্টায় সেই বাধা কাটিয়ে আমাদেরকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে হবে। রামায়ণে আমরা দেখতে পাই রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ। এখানে রাবণ আমাদের চোখে অধর্ম ও অশুভের প্রতীক। ছলে বলে কৌশলে রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল শ্রীলংকার অশোকবনে। রাবণের যদি লজ্জা বলে কিছু থাকতো, তাহলে রাবণ এইরকম ভাবে সে পরস্ত্রীকে হরণ করতো না। দীর্ঘদিন রাবণ সীতাকে লুকিয়ে রেখেছিল। এই সীতা হরণের কাহিনী এবং পরবর্তীকালে রাম কর্তৃক সীতা উদ্ধার রামায়ণের প্রতিপাদ্য বিষয়। রাম রাবণের যুদ্ধ রামকে সাহায্য করেছিল ভাই লক্ষ্মণ ও রামভক্ত হনুমানেরা। আবার পরোক্ষভাবে রাম কে সাহায্য করেছিল রাবণের ভাই বিভীষণ এবং তার স্ত্রী মন্দোদরী। বিভীষণ এখানে গৃহশত্রু, তিনি রাবণের সরলতা, দুর্বলতা, সফলতা, সবকিছুই জানেন। স্ত্রী মন্দোদরী রাবণের মৃত্যু বা রক্ষাকবচ হনুমান কে তুলে দিয়েছিলেন। রাম-রাবণের যুদ্ধে রাবণের পরাজয় ঘটেছিল। কারণ অশুভ শক্তির জয় সাময়িক হলেও দীর্ঘস্থায়ী হয়না। এক্ষেত্রে আমরা যে শিক্ষা পাই তা হল "অহংকার পতনের কারণ।"রাবণের অহংকার হয়েছিল, তাই তার পতন ছিল অনিবার্য। আপন ভাই যদি শত্রু হয়, তাহলে বিপদ আসতে দেরি হয়না। মন্দোদরী কে দেখে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, মেয়েদের সবকিছু খুলে বলতে নেই। মেয়েরা পারেনা এমন কোন কর্ম পৃথিবীতে নেই। নারী চরিত্র বুঝতে পারেননি স্বয়ং ভগবানও। যে নারী স্বামীর ক্ষতি চায়, ধ্বংস চায়, সে কি সত্যিই স্বামীর সহধর্মিনী? নারীর চরিত্র কি এরূপ হওয়া উচিত ? স্বামী খারাপ হলেও দুশ্চরিত্র হলেও তাকে ভালো পথে সঠিক পথে ফেরানো স্ত্রীর কর্তব্য। এক্ষেত্রে কুম্ভের একটি শ্লোক মনে পড়ে। শ্লোকটি হল-

"কলসস্য মুখে বিষ্ণু কণ্ঠে রুদ্র সংস্থিতা
মূলে তত্র স্থিতঃ ব্রহ্মা মধ্যে মাতৃপনা স্মর্তহঃ
কক্ষৌ সাগরঃ সর্বে সপ্তদীপাঃ বসুন্ধরাঃ,
ঋগ্বেদা ইয়াদা যজুর্বেদ সামবেদ অথর্ববেদা।"

এই শ্লোকটির ভাবার্থ হল " কলসির মুখে পালনকর্তা বিষ্ণু, কণ্ঠে ধ্বংসপতি মহাদেব, তলদেশে প্রজাপতি ব্রহ্মা আর অন্তঃপুরে রয়েছেন শক্তি রূপিনী সর্ব দেবিকা সহ পৃথিবী মা তৎসহ সপ্ত অনল বা সাত সাগর অনন্তের প্রতিভূ- এর অর্থ কলসরাণী এই ভান্ডেই আছে সবকিছু। ঘুরিয়ে বললে কলসে যা নেই আদি বা অন্ত এর কোনটাতেই তা নেই, এর কারণ হলো কলসের সাকার বা নিরাকার রূপক গুলি প্রজ্ঞাহীন। তাই কলস পরিপূর্ণ করার জন্য তার কক্ষে স্থান পেল ব্রহ্মজ্ঞানরূপী চার বেদ বা জ্ঞান এই মহাভাগ্য যেন এরকমই এক কলস, মানব শরীরও তেমন। তাকে পূর্ণ করতে হবে।তাই সবশেষে বলতে চাই মানুষ অভিজ্ঞতার মধ্যেই শেখে বা শিক্ষা লাভ করে। আবার বলছি প্রত্যেক মানুষ জন্মগতভাবে পশু। আমাদের পূর্বপুরুষেরা আদিতে ছিল বানর মানুষ তার সৃষ্টির মধ্যেই মনুষ্যত্ব লাভ করে। আবার মানুষ যখন ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয় তখন তাকে কি বলব বলুন আপনারাই ?

ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্ মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ

❒ প্রবন্ধ

সেকালের একালের স্বাস্থ্য চর্চা

অর্ঘ্য নায়ক, *শিক্ষক, শারীর শিক্ষা বিভাগ*

আমরা নাকি আধুনিক, তাইতো আজ পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে আমাদের সম্মানে বাধে। সাদামাটা ডাল-ভাত খেলে নাকি স্ট্যাটাস মেনটেন হয়না, ঢেঁকিতে পা দিয়ে চাল কোটা কিংবা কাঠের জালে রান্না করলে সেটা 'সেকেলে' বলে সম্বোধন করা হয়। সত্যি বড়ই অদ্ভুত এই সমাজ। সকালে উঠে ডাক্তারি ওষুধ খাওয়া নাকি স্বাস্থ্যকর তবুও ভেষজ গাছপালা নাকি অস্বাস্থ্যকর। পুরানো যুগে ছিল না কোনো স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ছিল না এত স্বাস্থ্যকর্মী, তবুও মানুষের কিন্তু সুস্থ স্বাভাবিক জীবন-যাপনে কোন সমস্যা হতো না। আর রাতেও নাকি ঘুমানোর জন্য ওষুধ খেতে হচ্ছে, শুধু তাই নয়, ঘুম থেকে উঠে আগে গিয়ে ওষুধের ব্যাগে হাত দিতে হচ্ছে। আসলে বর্তমান সময়টা পুরোটা দাঁড়িয়ে আছে কৃত্রিমতার উপর। ঘুম থেকে ওঠা এবং ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত প্রতিটা মুহূর্ত আমরা এই কৃত্রিমতার ঘেরাটোপে বন্দি। এজন্য দায়ী কিন্তু আমরা নিজেরাই, কারণ আমরা চাইলে আবার পরিবর্তন করতে পারি এই সমাজ ব্যবস্থার। আনতে পারি সেই দূষণ মুক্ত স্বচ্ছ বিশুদ্ধ নির্মল সকালটাকে।

খোলা আকাশ হারিয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে মাঠ
যানবাহনে বন্ধ হচ্ছে আমাদের রাস্তাঘাট।
ছেলেরা সব ভীষণ ব্যস্ত বই খাতা ল্যাপটপে,
নেইকো সময় ওদের কাছে খেলতে মাঠেতে।
ইলেকট্রিকের মেশিন দিয়ে হচ্ছে যে ম্যাসাজ
কিন্তু ওদের খোলা ছাদে ব্যায়াম করতে লাজ।

আমরা বর্তমানে সকলেই মানসিকভাবে হতাশাগ্রস্ত কোন না কোন বিষয় নিয়ে, তার কারণ একটা মন ভালো না থাকলে যেমন শরীর ভালো থাকে না, ঠিক তেমনি শরীর ভালো না থাকলে মনও ভালো থাকে না। আসলে মন আর শরীরের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্ক সঠিকভাবে তৈরি করতে পারে শরীরচর্চা। আসলে স্বাস্থ্যই মানুষের প্রধান সম্পদ, তাই শারীরিক সুস্থতার কোন বিকল্প নেই। আমরা যদি সেকালের এবং একালের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব কেন বর্তমানে মানুষের স্বাস্থ্যের এত অবনতি।

সেকালের জীবনযাত্রা:- তখনকার দিনে মানুষ পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতেন, ছিল না কোনো যানবাহন ব্যবস্থা। ছেলেমেয়েরা পুকুর ঘাটে সাঁতার কেটেছে, বিকালে খোলা মাঠে খেলাধুলা, গাছ থেকে টাটকা ফল পেড়ে খাওয়া। এইভাবে প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা তাই তাদের কোনদিন ঘুমানোর জন্য, খাবার খাওয়ার জন্য কোন ওষুধ খেতে হতো না, তাই তারা নির্ভয়ে পেটপুরে খেতে কোনও দ্বিধা করত না। তাইতো বলে প্রকৃতির কোন বিকল্প নেই।

একালের জীবনযাত্রা:- এখনকার ছেলেমেয়েরা ভুলে গেছে খেলার মাঠ। তারা জানেনা কিভাবে গাছে চড়তে হয়, তবে এতে তাদের দোষ নেই, দোষ হলো আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থার। জন্মের পর থেকেই তাদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে কৃত্রিম যন্ত্রপাতি। জানতে দেওয়া হচ্ছে না আমাদের প্রকৃতির মাধুর্যকে, বুঝতে দেয়া হচ্ছে না আমাদের সংস্কৃতিকে, শিখতে দেয়া হচ্ছেনা অনেক কিছু। তাই বলি–

কমাতে হবে কৃত্রিমতা, আনতে হবে নির্মলতা,
বাড়াতে হবে শরীরচর্চা, সেটাই হবে সঠিক শিক্ষা।।

তাই সুষম খাদ্যের সাথে সাথে নিয়মিত শরীরচর্চা একান্ত প্রয়োজন। কারণ একজন ব্যক্তিকে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি হিসেবে তৈরি করতে গেলে তাকে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক, নৈতিক সমস্ত দিক থেকেই সুস্থ থাকতে হবে। শারীরশিক্ষার দ্বারাই এই সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন সম্ভব।

যদি চাও সুস্থ শরীর, তাহলে করো যোগাসন
মনসংযোগ বাড়াতে হলে করতে হবে প্রাণায়াম মেডিটেশন
তার সাথে চাই সুষম খাদ্য
তবেই হবে সুস্বাস্থ্য।।

❒ প্রবন্ধ

মূল্যবোধের শিক্ষা ও বর্তমান সমাজ

সনাতন সাহু
শিক্ষক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

ভূমিকা:

এই আশ্চর্য পৃথিবীতে সৃষ্টির সবচেয়ে উন্নত জীব মানুষ। সে সৃষ্টির অকৃপণ দানে নিজের মস্তিষ্ককে কাজে লাগিয়ে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ করে উন্নত সভ্যতা গড়ে তোলে বর্তমানে নিজেই স্রষ্টা হয়ে উঠেছে। সেই আদিম যুগ থেকে সময়ের যত বিবর্তন ঘটেছে, সেই বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষ তৈরি করেছে সমাজ, তৈরি হয়েছে জাতি, দেশ। সময় যত এগিয়েছে মানুষের মানুষের সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়েছে ততই। কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলে প্রশ্ন আসে সৃষ্টির ঠিক কোন উপাদান দ্বারা মানুষ পৃথিবীর অন্যান্য জীবের থেকে পৃথক হয়ে উন্নততর সমাজব্যবস্থার পথে এগিয়ে এলো? এই প্রসঙ্গে প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে বলা যায় বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে আত্মার অন্তঃস্থলে মান এবং হুঁশের জাগরণই মানুষকে অন্যান্য জীবের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক চরিত্র থেকে আলাদা করেছে।

সমাজের বুকে তিল তিল করে গড়ে ওঠা নৈতিক আদর্শ পালনের মধ্য দিয়ে মানব চরিত্র ঠিক-ভুল, উচিত-অনুচিত সম্পর্কিত যে বোধ তৈরি হয় তাকেই মূল্যবোধ বলে। নৈতিক আদর্শের সুষ্ঠু অনুশীলন ছাড়া এই মূল্যবোধ গড়ে উঠতে পারে না। আর যদি কোনো মানুষের মধ্যে সামাজিক তথা মানবিক মূল্যবোধের সার্বিক বিকাশ ঘটে তাহলে সংশ্লিষ্ট সমাজে সেই মানুষ বিশেষ। আর পক্ষান্তরে মূল্যবোধহীনতা মানুষের জীবনকে ব্যর্থতার অন্ধকারে নির্বাসনের দিকে নিয়ে যায়। মূল্যবোধ হলো রীতিনীতি ও আদর্শের মাপকাঠি; যা সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়। নীতি ভালো-মন্দের মধ্যে একটা স্পষ্ট পার্থক্য গড়ে দেয়। সুতরাং ভিত্তি যদি নড়বড়ে হয়ে যায়, তাহলে সে সমাজ বা রাষ্ট্রের অনেক কিছুতেই ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়।

জীবনে মূল্যবোধের ভূমিকা:

বর্তমানে পৃথিবীর প্রযুক্তিগত চরিত্র আমূল বদলে গেলেও মানব জীবন ধারণের প্রাথমিক চরিত্র বিন্দুমাত্র বদলায়নি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সমাজের সর্বস্তরে মূল্যবোধের সার্বিক বিকাশ মানুষের মনকে সংকীর্ণ স্বার্থের গন্ডি থেকে মুক্ত করে সৃষ্টির পরমাত্মার সাথে মানুষের অন্তরাত্মার সার্থক মিলন ঘটাতে সাহায্য করে। ফলে সমাজ হয়ে ওঠে সুন্দর ও শাশ্বত।সমাজে মূল্যবোধের এই ব্যাপক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরে আমাদের অতীতকালের মনীষীগণ মানুষের ছেলেবেলা থেকে নৈতিক শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন নৈতিক শিক্ষা ছাড়া মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের পূর্ণ বিকাশ ঘটবে না এবং মূল্যবোধহীন কোনো সমাজ অনাচারের স্বর্গরাজ্য। সেকারণে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী গুরুগৃহে শিক্ষা গ্রহণের সময় ভারতীয়দের পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি বৌদ্ধিক বিকাশের দিকেও নজর দেওয়া হতো। বিভিন্ন সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিন্তা করার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তুলে পুঁথিতে লিপিবদ্ধ নীতিকথার সঙ্গে বাস্তব জীবনের সার্থক মিলন ঘটিয়ে দেওয়া হতো।এছাড়া প্রতিনিয়ত বিভিন্ন নীতিমূলক কাহিনির মাধ্যমেও শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হতো। এই বহুমুখী পদ্ধতির মধ্যে শিক্ষা জীবন যাপন করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের অন্তরাত্মায় মূল্যবোধের উল্লাস ঘটতো। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে নীতিশাস্ত্রের ওপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে উপমহাদেশের প্রাচীন মনীষীদের এই পরম উপলব্ধির কারণেই।

আধুনিক সমাজে মূল্যবোধ:

কালের বিবর্তনে সবকিছুই যেমন ক্ষয় হয় এক্ষেত্রেও তেমনই ক্ষয় হয়েছে মানুষের মূল্যবোধ এবং নৈতিকতাবোধেরও।

সভ্যতা যতই আধুনিক যান্ত্রিকতার দিকে এগিয়েছে মানুষের ভোগ মূলক লালসাও ততোই উর্দ্ধমুখী হয়েছে। এই লালসার বশবর্তী হয়ে মানব চরিত্র গঠনের প্রধান উপাদান রিপুরাজির সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে মানুষের মূল্যবোধের ধারণা। এইভাবে মূল্যবোধ ধীরে ধীরে গৌণ হতে হতে মানুষের ব্যাপক ভোগমূলক বাসনার নিচে চাপা পড়ে গিয়েছে। বর্তমান যুগে মানুষ অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার দিকে। বলাবাহুল্য মূল্যবোধহীন সমাজে সেই আত্মস্বার্থের চরিত্র মূলত লালসামূলক এবং নীতি-নৈতিকতা বোধশূন্য হয়।

সমাজে মূল্যবোধহীনতার কারণ:

বর্তমান সমাজে নৈতিক মূল্যবোধহীনতার কারণ হিসেবে নির্দিষ্ট করে কোন একটি বিষয়কে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ একজন মানুষ বা কোন সমাজের মূল্যবোধ যেমন একদিনে গড়ে ওঠে না, তেমনি একদিনে শেষও হয়ে যায় না। মূল্যবোধ গড়ে ওঠার মতন, মূল্যহীনতার বাতাবরণ গড়ে ওঠাও একটি দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া। এই দীর্ঘকালব্যাপী প্রক্রিয়াতে বিভিন্ন বিষয় এই বাতাবরণকে প্রভাবিত করতে পারে। তবে সাধারণভাবে মূল্যবোধহীনতার প্রাথমিক কারণ হিসেবে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা যায় মানুষের সর্বগ্রাসী লালসা ও ভোগের বাসনাকে। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ভগবান বুদ্ধ বলেছিলেন আকাঙ্ক্ষাই সকল দুঃখের কারণ। বর্তমান সমাজেও এই আকাঙ্ক্ষাই মানুষের সকল সমস্যার জন্ম দেয়।এই আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা থেকেই সৃষ্টি হয় লোভ, সেই লোভ জন্ম দেয় সংকীর্ণ স্বার্থের এবং সেই সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়েই সৃষ্টি হয় মূল্যবোধহীনতা। আধুনিক সমাজে যান্ত্রিকতা ও প্রযুক্তিগত উন্নতি যতই উর্দ্ধমুখী হচ্ছে, ততই মানুষের ভোগের বাসনাও বেড়ে চলেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সার্বিক মূল্যবোধহীন মানসিকতার পরিবর্তনও ঘটানো যাচ্ছে না।

মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত ফলাফল:

একটি নৈতিক শিক্ষাহীন সমাজে মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় সেই সমাজকে বিভিন্ন দিক থেকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারে। নৈতিকতার বিচ্যুতি বর্তমানে আমাদের সমাজের সবক্ষেত্রেই দেখা যায়। বিচ্যুতি নেই এমন স্থান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষকতা, ছাত্র ও অভিভাবক দিয়েই শুরু করা যাক। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ার প্রথম ধাপ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, যেখানে প্রত্যেকের একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকে।পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি নৈতিকতা, আদর্শ, আচার-আচরণ শেখানো হতো। শিক্ষক যখন এ রকম কুকর্মে লিপ্ত থাকেন, সেই শিক্ষকের কাছ থেকে নৈতিকতা শেখার কোনো সুযোগ নেই।অভিভাবক যখন তাঁদের ছেলেমেয়েকে অনৈতিক পন্থায় পরীক্ষায় পাস বা সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার জন্য সমর্থন করেন, তখন ছেলেমেয়েদের মধ্যে নৈতিকতার কোনো বিকাশ হবে না, এটাই স্বাভাবিক। যখন এ রকম পরিস্থিতি ক্রমশ বাড়তে থাকে, শিক্ষাঙ্গনে একটা অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরীক্ষায় ফেল করলে শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীদের মিছিল, শিক্ষকের পদত্যাগ দাবি করা, শ্রেণিকক্ষে তালা দেওয়া, ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বরের সুযোগ ব্যবহার করে প্রাইভেট টিউশন নিতে বাধ্য করা, কী নেই। এভাবেই শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত দুমড়ে মুচড়ে ফেলা হচ্ছে নৈতিকতাকে আর কলুষিত করা হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। নিয়োগ-বাণিজ্যের মাধ্যমে অদক্ষ লোকবল নিয়োগ, পদোন্নতি, পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার থেমে নেই। পুরোদমে চলে সরকারের ও অন্যের অর্থ কীভাবে লোপাট করে নিজের করা যায় সেই ধান্দা। মানুষ এতটাই দিশেহারা হয়ে গেছে যে ঠিক-বেঠিকের মধ্যে কোনো তফাত খুঁজে পায় না।

মূল্যবোধহীনতার তেমনই অসংখ্য ফলাফল ইতিমধ্যে আমরা সমাজে দেখতে পাচ্ছি। মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত ফলাফলগুলির চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গেলে সর্বপ্রথম বুঝতে হবে সমাজের এই হীন চরিত্রের উৎস হলো মানুষের লোভ।এই লোভই বর্তমান সমাজে জন্ম দিয়েছে অনাচার, বিশ্বব্যাপী দুর্নীতি এবং বিধ্বংসী সন্ত্রাসের। প্রতিমুহূর্তে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে এসবের মূল্য চোকাতে হচ্ছে। সমাজের বর্তমান যুগে মূল্যবোধহীনতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে মানুষে মানুষে স্বাভাবিক পারস্পরিক সম্পর্কও আধুনিক সমাজের কৃত্রিম যান্ত্রিকতার বেড়াজালে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। নৈতিক শিক্ষার একান্ত অভাবের ফলেই বর্তমানে ভাইবোনের মধ্যে ভোগকেন্দ্রিক বিবাদ, পিতা-মাতার সঙ্গে বিবাদ ও সম্পর্ক ছেদ, সমাজের সর্বস্তরে নৃশংস সব ঘটনা ইত্যাদির মাত্রা ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছে।

সামাজিক অধঃগতি থেকে উত্তরণের উপায়:

সবাই যদি নিজের কাজটি সঠিকভাবে করি, তাহলেই নৈতিকতার অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব। সমাজের অন্যায়-দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। নিজে না করে অন্যকে সকাল-বিকেল দোষারোপ করে কোনো সমাধান হবে না। শিক্ষাক্ষেত্রের পবিত্রতা রক্ষা করা, আইনকে নিয়মানুযায়ী প্রয়োগ করা, অর্থাৎ কোনো প্রকার দুর্নীতির আশ্রয় না নিলেই কেবল এই পরিস্থিতির উন্নয়ন সম্ভব। এমন নয় যে আমরা বিবেকহীন, নীতিহীন, আদর্শবিহীন এক লোভী মানুষে পরিণত হয়েছি; যা থেকে আমরা নিজেরাই সরে আসতে চাই না? বর্তমান যুগে সমাজে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার অধিকাংশেরই উৎস লুকিয়ে আছে ক্রমবর্ধমান মূল্যবোধহীনতার মধ্যে। তাই মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের পুনর্বিকাশ ঘটাতে না পারলে কোন দিনই এই সকল সমস্যা থেকে মুক্তি লাভ করা যাবে না; কেবল বিভিন্ন যান্ত্রিক নিয়মাবলী আরোপ করে সাময়িকভাবে এই সমস্যাগুলিকে ঠেকিয়ে রাখা যেতে পারে মাত্র। মানুষের মনে মূল্যবোধের বিকাশকে পুনরায় জাগিয়ে তুলতে গেলে সর্বপ্রথম প্রত্যেকটি মানুষকে জীবনের প্রথম পর্যায় থেকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সেই নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যখন মানুষ যৌবনে প্রবেশ করবে তখন অন্তরে লুকিয়ে থাকা মূল্যবোধের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে মানুষের মানবসত্ত্বার সার্থক বিকাশ ঘটবে। আর সার্থক মূল্যবোধসম্পন্ন অসংখ্য মানবসত্তা দ্বারা যখন একটি সমাজ গড়ে উঠবে তখন অচিরেই সেই সমাজ থেকে সকল সমস্যা দূরীভূত হবে।

উপসংহার:

এ পৃথিবীতে প্রতিটি সৃষ্টির নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। কারণ ছাড়া যেমন কার্য ঘটে না, তেমনি পৃথিবীর কোন সৃষ্টিই প্রসঙ্গহীন নয়। জীবনে জন্মাবার পর পূর্ণ বিকাশের দ্বারা সত্যিকারের মানুষ হয়ে আপন জীবনের সেই উদ্দেশ্য অনুসন্ধানই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু মানুষের জীবন যদি মূল্যবোধহীন হয়, তাহলে পূর্ণ বিকাশের দ্বারা একজন সার্থক মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটিই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আপনি নিজের যে কাজের জন্য মাসিক বেতন নেন, সেই কাজটি ঠিকমতো করুন। অন্যকে বিপদে ফেলার মতো, দুর্নাম করার মতো ঘৃণ্য কাজ করা থেকে বিরত থাকুন। ভালোকে ভালো বলতে শিখুন, খারাপকে খারাপ বলার মতো সৎসাহস রাখুন। নিজের অবস্থান থেকে নৈতিকতাকে আগলে রাখুন। জীবন তাহলে একটি গোলক ধাঁধায় পাক খেয়ে বেড়াবার মতই বিভ্রান্তিকর ও অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। আর একটি অর্থহীন জীবন পৃথিবীর কাছে বোঝা ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। সেজন্য নৈতিক শিক্ষার অনুশীলনের মাধ্যমে আপন অন্তরাত্মায় মূল্যবোধের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে মান এবং হুঁশের সার্থক সৃষ্টি দ্বারা জীবনের প্রসঙ্গ অনুসন্ধানই হোক মানব জীবনের মৌলিক লক্ষ্য।

গ্রন্থপঞ্জি:

শিক্ষায় শান্তি ও মূল্যবোধ- ড. প্রদীপ রঞ্জন রায়, অদিতি রায়
শান্তি ও মূল্যবোধশিক্ষা-পাল, দেবনাথ
শান্তি ও মূল্যবোধ শিক্ষার ধারণা- ড.প্রণব কুমার চক্রবর্তী
Peace and Value Education- M. Brindhamani

The happiness of society is the end of government - **John Adams**

❒ প্রবন্ধ

বাঁকুড়া ও বর্ধমানের গাজন প্রসঙ্গ

রুনু ঘোষ
সহকারী অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ
গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়

বাঁকুড়া ও বর্ধমান এই দুই জেলাতেই গ্রামে গ্রামে প্রচুর লোক উৎসব প্রচলিত। এর মধ্যে একটি উৎসব হল গাজন যার সাথে মানুষের আন্তরিক এক যোগাযোগ লক্ষণীয়। গাজন উৎসব মূলত অনার্য কৌমসংস্কৃতি জাত। বাঁকুড়া এবং বর্ধমান এই দুই জেলাতেই মূলত গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় শিব ঠাকুর এবং ধর্মঠাকুর এই দুই দেবতা কে কেন্দ্র করে। গাজন সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে গাজন শব্দের উৎপত্তি-সম্বন্ধে আলোকপাত করলে দেখা যায় সংস্কৃত শব্দ 'গর্জন' থেকে প্রাকৃত এ এসেছে গজ্জন। গজ্জন রূপান্তরিত হয়ে বাংলায় হয়েছে গাজন।

যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় গাজন সম্পর্কে বলেছেন গাজনের প্রকৃত বিষয় হরকালীর বিবাহ। সন্ন্যাসীরাএই বিবাহে বরযাত্রী এবং তাদের গর্জন থেকে গাজন শব্দ এসেছে। ধর্মের গাজন এ মুক্তির সঙ্গে ধর্মের বিবাহ আবার আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর বিবাহ দেওয়াই গাজন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। চৈত্র মাস থেকে বর্ষা শুরু পর্যন্ত সূর্য যখন প্রচন্ড অগ্নিরূপ ধারণ করে তখন সূর্যের তেজ প্রশমন ও বৃষ্টি লাভের জন্য কৃষিজীবী সমাজ এই অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন করেছিল।

যারা দেবতাদের বিবাহের সাথে যুক্ত হবেন তাদের ত্যাগ ও নিষ্ঠা পালন করতে হবে। সন্ন্যাসীরা যেহেতু দেবতাদের বিবাহে বরযাত্রী তাই তারা কয়েকদিন ধরে নিয়ম নিষ্ঠা পালন করেন। প্রথম দিন ক্ষৌরকর্ম (গ্রাম্য ভাষায় কামানো বা কামান) এবং একবেলা নিরামিষ আহার করতে হয় সেদিন । পরের দিন অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন উত্তরীয় ধারণ ও বেত্রদণ্ড গ্রহণ করেন ভক্ত সন্ন্যাসীরা এবং হবিষ্যান্ন আহার করেন। পরের দিন গাজন সন্ন্যাসীরা সারা দিন উপবাস করে পুজো করেন এবং ফলাহার করেন। গাজন সন্ন্যাসীদের চতুর্থ দিনও সারা দিন উপবাস এবং তার সাথে কোথাও বিভিন্ন পুজো কোথাও বান ফোঁড়া কোথাও পাট ভাঙ্গা ইত্যাদি নিয়ম-কানুন পালন করতে হয় এবং তারপর তরল পানীয় যথা দুধ, শরবত ইত্যাদি গ্রহণ করেন। সবশেষের দিন সন্ন্যাসীরা উত্তরীয় ত্যাগ করেন। নিমপাতা বাটা, কাঁচা হলুদ এবং সরষের তেল মেখে নদী বা পুকুরের স্নান করার সময় উত্তরীয় ত্যাগ করেন, ওই দিনও তারা নিরামিষ আহার করেন, গাজন সমাপ্ত হয়।

বাঁকুড়ার বিভিন্ন গ্রামে শিব ঠাকুর ও ধর্মঠাকুরের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বতন জেলা বোর্ডের নথি অনুযায়ী ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে এ জেলায় মেলার সংখ্যা ছিল ১৭৬। এগুলির মধ্যে পাঁচ ভাগে বিভক্ত গাজনের সংখ্যা ছিল ৫২। এরমধ্যে গাজন মেলা ২৮. শিব গাজন ১০, আবাল গাজন ৯, চৈত্র গাজন ৪ এবং রানীর গাজন (ছাতনা) ১। সেই সময় দেড় লক্ষাধিক নর-নারী এই গাজন গুলিতে অংশগ্রহণ করত এবং প্রায় সবাই নিম্নবর্গীয়। গাজন সন্ন্যাসী বা ভক্তরা সন্ন্যাস গ্রহণের সাথে সাথে নিজ জাত-কুল-গোত্র ত্যাগ করে শিব গোত্র লাভ করে। গাজন সেসময়ের কঠিন ও নীরস জীবনে ছিল মুক্তির মত। গাজন নিয়ে আসত নতুন উৎসাহ ও কর্মোদ্যম। বাঁকুড়া জেলার বিখ্যাত গাজন হলো বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর এর গাজন, বিষ্ণুপুরের ডিহর এর ষাঁড়েশ্বর এর গাজন, বড়জোড়ার বাবা ভুবনেশ্বর এর গাজন, পাঁচালের গাজন, মটগোদার গাজন, ছাতনার মনতুমরা গ্রামের শিবের গাজন, বড়জোড়া থানার জগন্নাথপুরের গাজন। এই গাজন গুলি কোনোটা শিব ঠাকুর কোনোটা বা ধর্ম ঠাকুরের। চৈত্র সংক্রান্তিতে কয়েকদিন ধরে যে গাজনগুলি অনুষ্ঠিত হয় সেগুলিতে দিন গাজন, রাত গাজন, চড়ক দেখতে ভিড় উপচে পড়ে মন্দির চত্বর গুলিতে। হাজার হাজার মানুষ এই সব গাজন এ ভক্তা হন। চৈত্র সংক্রান্তি ছাড়াও অন্য তিথিতেও বাঁকুড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে গাজন অনুষ্ঠিত হয়। ধর্ম ঠাকুরের গাজনেও শালেভর, বানফোঁড়া, আগুনসন্ন্যাস ইত্যাদি আত্মনির্যাতনমূলক নিয়ম পালিত হয় অনেক স্থানে।

বর্ধমানের আদি জাতি হল ডোম, বাগদী, কাহার, শবর প্রভৃতি। মূলত ধর্ম ঠাকুর কে অবলম্বন করে বর্ধমানের আদি

জাতিগুলির ধর্মীয় সংস্কৃতি আবর্তিত হয়। ধর্ম ঠাকুরের মূর্তি কোথাও খোদাই করা বা কোথাও খোদাই করা থাকে না। এর আকার মূলত ডিম্বাকার বর্তুলাকার বা গোলাকার। সঙ্গে থাকে কাঠের তৈরি দু ফুটের মতো লম্বা বানেশ্বর। কাঠ টির নিচের দিকে থাকে চারটি পা আর ওপরের দিকে থাকে লোহার সুচালো কিছু কাঁটা। এই মূর্তি মূলত নিম কাঠ দিয়ে তৈরি হয় এবং দেখতে অনেকটা ঢেকির মত। গাজন সন্ন্যাসীরা বানেশ্বর কে কাঁধে চড়িয়ে এবং ধর্ম ঠাকুরের মূর্তি পালকিতে করে ঘোরান নগ্ন পায়ে। শিবের গাজন এর ক্ষেত্রে শিব মন্দির প্রাঙ্গণে এবং ধর্ম ঠাকুর এর ক্ষেত্রে ধর্ম ঠাকুর মন্দির প্রাঙ্গণে গাজন উৎসব পালিত হয় ঢাক ঢোল বাদ্য সহকারে ধুমধাম এর সাথে।

বর্ধমানে প্রচুর গাজন অনুষ্ঠিত হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে। বর্ধমানের কুড়মুন এর গাজন বেশ জনপ্রিয়। কুড়মুন এবং পাশাপাশি অবস্থিত গ্রামগুলিতে চৈত্র মাসের শেষ চার পাঁচ দিন গাজন অনুষ্ঠিত হয়। গাজন এ কিছু বীভৎস নিয়ম-কানুনও পালন করা হয় যা দেখতে ভিড় করেন অগণিত মানুষ। এরকম একটি নিয়ম অনুষ্ঠান হল নরমুণ্ড নাচ, সাধারণের অর্থে মড়ার মাথা নাচানো যা অনুষ্ঠিত হয়। গাজনের তৃতীয় দিন অর্থাৎ যেদিন ফলাহার করেন সন্ন্যাসীরা সেদিন খুব সকালবেলায় কুড়মুনের মতো পার্শ্ববর্তী গ্রাম দাসপুরেও নরমুন্ডু নিয়ে নাচ করে গাজন সন্ন্যাসীরা। সন্ন্যাসীরা মধ্যরাতে আশেপাশের গ্রামের কবরস্থান থেকে মৃতদেহের মাথা কেটে নিয়ে আসে সকলের অজান্তেই। সেই মাথাগুলি নিয়ে গাজন প্রাঙ্গণে ভোর বেলায় মন্দির পরিক্রমা করেন সন্ন্যাসীরা। মন্দির ঘুরে ঘুরে ঢাক ঢোল বাদ্য সহকারে মৃতদেহের সেই মাথাগুলি হাতে নিয়ে নাচতে থাকে গাজন সন্ন্যাসীরা। দীর্ঘসময় ধরে চলে এই নৃত্য। এই নাচ দেখতে বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ ভিড় করেন। আরেকটি নিয়ম হলো জ্বলন্ত কুল কাঁটার উপর নাচ। উপবাসের দিন সন্ধ্যাবেলায় মন্দির প্রাঙ্গণে কুল কাঁটা বিছিয়ে সেটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। আগুন নিভে এলে অঙ্গার হয়ে থাকা কুল কাঁটার উপর সন্ন্যাসীরা খালি পায়ে নাচতে থাকে বাজতে থাকে ঢাক। সঙ্গে মুখে থাকে শিবের জয়ধ্বনি। এরকম দৈহিক ক্লেশদায়ক নিয়মকানুন দেখতে ভিড় আছড়ে পড়ে মন্দির প্রাঙ্গণে। শিব গাজন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় বিরাট মেলা, যাত্রানুষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বেশিরভাগ বাড়িতে নিরামিষ আহার করা হয় এ সময়।

বৈশাখী পূর্ণিমায় ভাতার থানার অন্তর্গত পারহাট গ্রামে বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্ম ঠাকুর 'জাঙ্গিলা'র গাজন অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গে থাকে বানেশ্বর। জাঁকজমক সহকারে এই গাজন অনুষ্ঠিত হয়। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন সকালে পার্শ্ববর্তী গ্রাম তুরা হতে সন্ন্যাসীরা গাঁদা ফুলের মালায় সুসজ্জিত হয় ঢাকের বাদ্য সহযোগে। তুরার শুঁড়ি সম্প্রদায়ের বাড়ি থেকে নতুন মাটির হাঁড়িতে 'পঁচাই মদ' সংগ্রহ করে, পুজো করা হয়। তারপর সেই হাঁড়িগুলিকে গাঁদা ফুলের মালা দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়। সন্ন্যাসীদের পালকিতে থাকে সুসজ্জিত মাটির হাঁড়িতে মূল ভাঁড়াল। পালকি নিয়ে সন্ন্যাসীরা নাচ করতে করতে চলে এবং বাকি সন্ন্যাসীরা মাথায় ভাঁড়াল নিয়ে পিছনে চলে সঙ্গে থাকে অনেক ঢাক। রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় ভক্তরা দলে দলে প্রণাম করে। সন্ন্যাসীরা পার্শ্ববর্তী গ্রাম পারহাট পৌঁছায় পায়ে হেঁটে এবং সেখানে মন্দির প্রদক্ষিণ করে নাচতে থাকে যাকে বলে ভাঁড়াল নাচ। ধর্ম ঠাকুরের এই গাজনে ছাগ বলি হয়। ধর্ম গাজনে পশুবলি হল প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির ভগ্নাবশেষ। এখানে অনার্য সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষণীয়।

বাঁকুড়া ও বর্ধমানের গাজন উৎসবের মধ্যে লুকিয়ে আছে লোকসংস্কৃতির শিকড়। বছরের পর বছর ধরে ভক্তি সহকারে গাজন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। গাজন সন্ন্যাসী বা ভক্তারা শারীরিক ক্লেশ সহ্য করে এই ধারাকে বহমান রেখেছেন। সুদীর্ঘ অতীত থেকে মানুষের আবেগ জড়িয়ে আছে এর সাথে। তাই বিশ্বায়নের যুগও এই গাজন উৎসবকে ম্লান করতে পারেনি।

সহায়ক গ্রন্থ :

প্রাচীন বর্ধমানের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চেতনা - নীরদবরণ সরকার।
বাঁকুড়া জনের ইতিহাস ও সংস্কৃতি - শ্রী রথীন্দ্র মোহন চৌধুরী।

সহায়ক পত্রিকা

আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন বাঁকুড়া, ১৪ এপ্রিল, ২০১৫, ০০:৫৪.

প্রবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গের জীববৈচিত্র্য

মৌমিতা গড়াই, শিক্ষিকা, ভূগোল বিভাগ

উত্তরে সুদূর হিমালয় থেকে দক্ষিণে নিবিড় বাদাবন সংকুল আর দীর্ঘ উপকূল, পশ্চিমে লাল মাটির দেশে শাল পিয়ালের অরণ্য ভারতবর্ষের আর কোন রাজ্যে নেই পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া। স্বভাবতই জীব বৈচিত্র্যের নিরিখে দেশের অন্যতম শীর্ষ রাজ্য।ভৌগোলিক দেশের স্থলভূমির মাত্র ২.৭ শতাংশ এই রাজ্যের। অথচ গোটা দেশে যে ১০ প্রকারের ভৌগোলিক অঞ্চল রয়েছে তার মধ্যে চার প্রকারের অবস্থান পশ্চিমবঙ্গে। এগুলি হল –হিমালয় পর্বতমালা (মধ্য হিমালয়) গাঙ্গেয় সমভূমি (নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকা)' উপকূল (পূর্ব উপকূল) এবং দাক্ষিণাত্যের মালভূমি (ছোটনাগপুর পুরুলিয়া বাঁকুড়া)। এ রাজ্যের বিপুল জীবজগতে রয়েছে Palerctic, Indomalayanএবং Afro-tropical জীবভৌগলিক উপাদান।

পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তনের ১৩.৪% বনাঞ্চলে মোট ১০ ধরনের অরণ্য দেখা যায়। এর মধ্যে ৩১.৭৫%শতাংশ মাত্র সংরক্ষিত বনাঞ্চল। বলাবাহুল্য রাজ্যের মোট পরিষদের খুবই সামান্য বিধিবদ্ধ সংরক্ষণ এর আওতায়। সংরক্ষিত এলাকার বাইরে যে বিপুল পরিসর তার মধ্যেও ছড়িয়ে আছে প্রাচুর্যময় এক জীবকুল। গ্রাম বাংলার আনাচে-কানাচে, ঝোপঝাড় পুকুর-ডোবা-খাল বিল বাসভূমি যে জীবজগতের, তাদের অনেকেই আজ হারিয়ে যাবার পথে। সংরক্ষণের বাহিরেও এদের বাঁচিয়ে রাখতে প্রয়োজন সংঘবদ্ধ প্রয়াসের।

সংরক্ষণের আওতায় যে সমস্ত বনাঞ্চল তারমধ্যে উল্ল্যেখযোগ্য অত্যুচ্চ ও নাতিশীতোষ্ণ বনাঞ্চল,উত্তরবঙ্গের তরাই এলাকার গ্রীষ্মমন্ডলীয় বনাঞ্চল, দক্ষিণের শুষ্ক পর্ণমোচী বনাঞ্চল এবং দীর্ঘ ২১২৩ কিমি বিস্তৃত সুন্দরবনের বাদাবন বা ম্যানগ্রোভ। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় সুন্দরবনের জীবকুলের ব-দ্বীপের জোয়ার-ভাটার তালে তাল মিলিয়ে পর্যায়ক্রমিক মিষ্টি আর নোনাজলে খাপখাইয়ে জীবনযাপন এদের। এই রাজ্যে রয়েছে প্রায় ৫৪ টি প্রধান (১০০ হেক্টর) প্রাকৃতিক জলাভূমি। প্রধান এই জলাভূমি গুলি ছাড়াও বাংলার গ্রামের প্রান্তরে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য বিল আর ঝিল। নানান প্রজাতির মাছ, জলচর, পাখি, উদ্ভিদ এবং জীব জগতের বিভিন্ন সদস্যদের বিপুল সমারোহ এই জলাভূমিগুলিতে। সরাসরি যে বাস্তুতান্ত্রিক পরিষেবা দিয়ে থাকে এসব জলাভূমি তার মধ্যে অন্যতম বন্যা এবং জলস্তর নিয়ন্ত্রণ। পৃথিবীর প্রধান প্রধান জলাভূমিকে 'রামসর সাইট' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কলকাতা শহরের পূর্ব উপকণ্ঠে বিস্তৃত যে ভেড়ি অঞ্চল তা রামসর সাইট হিসেবে চিহ্নিত।

উদ্ভিদসম্পদ - প্রায় ৭০০ প্রজাতির উদ্ভিদ (ব্যাকটেরিয়া সহ) নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জলবায়ু ও উচ্চতায় ছড়িয়ে আছে এক বিশাল বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদকুল. গুপ্তবীজী (৩৫৮০ প্রজাতির),ব্রায়োফাইট বা ফার্ণজাতীয় (৫৫০ প্রজাতির) এবং টেরিডোফাইট বাফার জাতীয় (৪৫০ প্রজাতির) উদ্ভিদকুলের বৈচিত্র উল্লেখ্যযোগ্য। এছাড়াও এ রাজ্যে শৈবাল ও ছত্রাক এর প্রায় ৮৫০ টি প্রজাতির খোঁজ মেলে। এই রাজ্যের স্থানীয় পুষ্প উদ্ভিদের মধ্যে প্রচুর বহিরাগত ফুলগাছ অন্তর্ভুক্তিকরণ উল্লেখযোগ্য। বেশকিছু বহিরাগত উদ্ভিদের বাড়বাড়ন্ত দেশীয় উদ্ভিদকুলের সংরক্ষণের সংকট পশ্চিমবঙ্গের কৃষি জীব-বৈচিত্র উল্লেখ করার মতো। দুঃখের বিষয় গত পাঁচ দশকে এই অমূল্য বৈচিত্র্যের অনেকটাই হারিয়ে গেছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী সবুজ বিপ্লবের আগে এ রাজ্যে প্রায় ৪২০০ ধরনের ধান ছিল। এইসব স্থানীয় ধানের বৈচিত্র শত শত বছরের লোকজ্ঞান-নির্ভর পরীক্ষা নিরীক্ষার ফসল। স্থানীয় নানান কৃষি বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ একটি জরুরী প্রয়োজন।

প্রাণি সম্পদ –পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরনের বাস্তুতান্ত্রিক বাসস্থানগত সমাবেশ এক বিপুল ও বৈচিত্রময় প্রাণীকুলের ধারক। প্রাপ্ত মোট ১১০০০ প্রজাতির প্রাণী, সমগ্র দেশে প্রাপ্ত মোট প্রজাতির প্রায় ১১ শতাংশ। রয়েছে প্রচুর স্থানীয় প্রজাতির প্রাণী যা কেবলমাত্র এই রাজ্যের বিশেষ কিছু অঞ্চলে পাওয়া যায়। জেলাগুলির মধ্যে দার্জিলিং প্রাণীবৈচিত্রে শীর্ষস্থান দখল করে রয়েছে (৪২৮৯ প্রজাতি)। আশ্চর্যভাবে তারপরেই রাজধানী কলকাতার স্থান (২৫৫৩ প্রজাতি)। সুন্দরবন তার ব্যাপক জীববৈচিত্র এ কারণে প্রায় (১১০০ ১৫০০ প্রজাতি) ও জীবকুলের স্বতন্ত্রতা এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এই বদ্বীপ অঞ্চলের স্থানীয় অমেরুদণ্ডী প্রাণী প্রজাতির রাজকাকড়া বা king crab প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে। এছাড়াও সুন্দরবন অঞ্চলের বিপুল মেরুদণ্ডী প্রাণীর বৈচিত্রও লক্ষণীয়। এই অঞ্চল প্রায় ১৪১ প্রজাতির মাছ,৮ প্রজাতির উভচর,৫৭ প্রজাতির সরীসৃপ, ১৬১ প্রজাতির পাখি ও ৪০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণীদের আবাসস্থল। সুন্দরবনের প্রাণিকুলের বর্ণনা ``বাদাবনের বাঘ" বা রয়েল বেঙ্গল টাইগার এর উল্লেখ ছাড়া অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ভয়ঙ্কর সুন্দর এই প্রাণীটি পৃথিবীর একমাত্র এই অঞ্চলে অভিযোজিত, যাদের বর্তমান পরিসংখ্যা এক বিতর্কিত ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী। এই বাস্তুতন্ত্রের অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে মোহনার কুমীরও বিলুপ্তপ্রায়। মেছো বিড়াল, Snub nosed Dolphin, Little Porpoise, দৈত্য বক এই অঞ্চলের অন্যান্য বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মধ্যে সঙ্কটাপন্ন। বিগত দুই দশকে লুপ্ত হয়েছে জাভা দেশীয় গন্ডার, বন্য মহিষ, বানর, হরিণ, Swap Dear এবং White winged wool Duck ।

সংরক্ষন জনিত সংকট–পশ্চিমবঙ্গের বিপুল সম্পদ আজ সংরক্ষণ জনিত সমস্যার মুখে। গত কয়েক দশকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ এবং নগরায়নের কারণে হারিয়ে যাচ্ছে প্রাকৃতিক বাসস্থান। অবহিত হচ্ছে বনাঞ্চল। কলকারখানা আর কীটনাশক জনিত দূষণ আরো ঘনীভূত করেছে এই সংকটকে। এরাজ্যের বুকে হারিয়ে গেছে ও হারিয়ে যাচ্ছে অমূল্য জীববৈচিত্রের নানা উপাদান। অধুনালুপ্ত প্রজাতির মধ্যে এশীয় দ্বিশিঙ্গ গন্ডার, নীলগাই, কৃষ্ণসার মৃগ, কস্তুরীমৃগ ও তুষার চিতা,Black Finless Propoiseএবং Indian Pilot whale প্রভৃতি স্তন্যপায়ী প্রাণী উল্লেখযোগ্য। পাখিদের মধ্যে Monal Pheasant, গোলাপি মাথা হাঁস এবং পাহাড়ি তিতির উল্লেখযোগ্য। সবশেষে পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ২৬ প্রজাতির স্তন্যপায়ী,২৫ প্রজাতির পাখি,১৪ প্রজাতির সরীসৃপ ও অন্তত একটি উভচর প্রজাতির প্রাণীর অস্তিত্ব সংকটের মুখে। বিশেষভাবে সঙ্কটজনক ও বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হিমালয়ের Tahr, এশিয়ার কালো ভাল্লুক, Twee banded Palm civet বা ভাম, Hog badger, Burmese Ferrer Badger এবং Bengal Plorican আজ অবলুপ্তির পথে। খুব দ্রুত আমাদের নতুন কোন পথ বের করতে হবে পশ্চিমবঙ্গের জীববৈচিত্র রক্ষার জন্য।

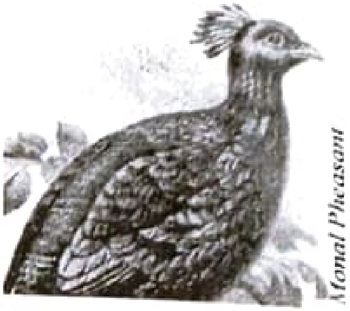

☐ প্রবন্ধ

আদর্শ শাসনব্যাবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র

আব্বাসউদ্দিন মন্ডল

শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

বর্তমান বিশ্ব গণতন্ত্রের জয়গানে মুখর। তত্ত্বকথা বিচারে আদর্শ ও সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা জগতে সর্বজনস্বীকৃত। প্রাচীন গ্রিক রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় স্বাধীনতা ,সাম্য ও সমানাধিকারের দাবির ভিত্তিতে যে গণতান্ত্রিক ধারণার উৎপত্তি,বিংশ শতাব্দীতে তা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রতন্ত্রের বৃহত্তর ও মহান আদর্শে পরিণত হয়েছে । প্রাচীনকাল থেকেই রাষ্ট্র পরিচালনায় বিভিন্ন ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত রয়েছে। নানা ধরনের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে গণতন্ত্র অন্যতম। গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাভাবনার ব্যাপক প্রভাবে বর্তমান শতাব্দীতে অন্যান্য শাসন ব্যবস্থার ধারণা হীনমান। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হচ্ছে জনগণের সম্মতি ভিত্তিক জনকল্যাণমুখী একটি শাসনব্যবস্থা । সেজন্য বর্তমান পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক নির্বিশেষে সকল রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের প্রতি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় । গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসনকার্যে যেমন নাগরিকের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ থাকে, তেমনি প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের নিজেদের পছন্দমত ভোট প্রদান করতে পারে এবং যে রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে তারাই গণতন্ত্রে সরকার গঠন করে। নির্বাচনে পরাজিত পক্ষ বিরোধী দল হিসেবে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে। শক্তিশালী বিরোধী দল থাকলে সরকার স্বৈরাচারী হতে পারে না। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় যেহেতু প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়, তাই শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা যায়। ফলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যাপক সুযোগ ঘটে। তাছাড়া গণতন্ত্রের সকলের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে। তাই সরকারকে তাদের নিজেদের সরকার হিসেবে ভাবে। তার ফলে জনগণের মধ্যে স্বদেশপ্রীতি সৃষ্টি হয় এবং দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। এই দেশপ্রেম কালক্রমে আন্তর্জাতিকতার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত ও সংরক্ষিত। জনগণ যদি মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে । এখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ ,স্ত্রী-পুরুষ,উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলের জন্য আইন সমান । গণতান্ত্রিক সরকার যেহেতু জনমত পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা তাই এখানে সরকার স্বৈরাচারী হতে পারে না। সরকারকে সবসময় জনগণের কথা মাথায় রাখতে হয় । জনমতকে উপেক্ষা করলে ক্ষমতাসীন সরকার পরবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । প্রয়োজনবোধে জনগণ শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারের পরিবর্তন করতে পারে। এ জন্য জনগণকে রক্তক্ষয়ী বৈপ্লবিক পন্থা অবলম্বন করতে হয় না। গণতন্ত্রে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকল সমস্যার সমাধান করা যায় । রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতা দখলের জন্য ও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য নির্বাচনের সময় নির্বাচনী প্রচার করে এবং অন্যান্য সময়ও করে থাকে। রাজনৈতিক দলগুলি দেশের বিভিন্ন সমস্যা এবং তার সমাধান সম্পর্কে জনগণের সম্মুখে নিজ নিজ নীতি,পরিকল্পনা ,কর্মসূচি, ইস্তেহার পেশ ও বিশ্লেষণ করে । তাছাড়া বিরোধী দলগুলি সরকারি দলের কার্যাবলী

সম্পর্কে জনগণকে অবহিত রাখে। এর ফলে জনগণ সকল বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকে। জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় । তাছাড়া প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ সরকারের সংগত রাখে। প্রকৃত প্রস্তাবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণের প্রতি শাসকের দায়িত্বশীলতা সুনিশ্চিত করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবিধানের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় । সরকারকে সংবিধান সামনে রেখে কাজ করতে হয় । সরকার সংবিধানের উর্দ্ধে কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারে না এবং সংবিধানকে অমান্য করার এক্তিয়ার নেই । ফলে সরকারের স্বৈরাচারী হওয়ার সম্ভাবনাও কম থাকে।

অনেক গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের বিপুল অংশ নানাবিধ অজ্ঞতা ,অজ্ঞানতা, কুসংস্কারগ্রস্ত থাকে । এ ধরনের সমাজের মধ্য থেকে উঠে আসা জনপ্রতিনিধিদের অনেকের মধ্যে এসব দুর্বলতা বিরাজ করে । নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের বেশিরভাগই প্রশাসনিক জ্ঞান থাকে না। তাই তাদের আমলাদের উপর নির্ভরশীল হতে হয় । ফলে আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন হওয়ায় সংখ্যালঘুরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইন সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারে না। এই কারণে অনেক সময় তাদের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়ে থাকে। গণতন্ত্রে জনমত গঠন, নির্বাচন অনুষ্ঠান ,প্রচারকার্য প্রভৃতির পেছনে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে এবং জরুরি স্বার্থে তাৎক্ষণিক কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া অনুপোযোগী ।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে নানা অভিযোগ থাকলেও বর্তমান সময়ে গণতন্ত্র হলো সবচেয়ে জনপ্রিয় শাসন ব্যবস্থা এবং আদর্শগত বিচারেও গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা। গণতন্ত্রে জনগণের মতের প্রতিফলন হয়ে থাকে । গণতন্ত্রের মাধ্যমেই রাষ্ট্রে আইনের অনুশাসন ,ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এর মাধ্যমে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাংবিধানিক শাসন প্রতিষ্ঠা ও জনগণের সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সরকার পরিচালনার বহু পদ্ধতি রয়েছে ,সকল পদ্ধতি অপেক্ষা গণতন্ত্রকে বলা হয় আদর্শ শাসনব্যবস্থা। এই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আকস্মিকভাবে অর্জন করা যায় না এবং টিকিয়ে রাখা যায় না । এর জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন জনগণ, গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রসার, জাতীয় ঐক্যমত, আইনের শাসন ও দায়বদ্ধ সরকার।

Two cheers for Democracy : One, because it admits variety; and two, because it permits criticism. **-E.M. Forster**

মেয়েবেলা

গার্গী ব্যানার্জী, *শিক্ষিকা, দর্শন বিভাগ*

কোন এক মেঘলা দুপুরে
মনে পড়ে হারানো মেয়েবেলা
খেলনাবাটি, মাটির পুতুল, রঙিন রথের মেলা
জীবন যেন নদীর মতো
স্থিরতা হীন।।
কখন আলো, কখন আঁধার
রঙীন বা রঙ হীন
ঝড়-ঝাপটা, ভেঙে পড়া
ক্লান্ত ছুটি হীন।।
তারই মাঝে স্বপ্ন গুলো
ঝিনুকের মতো, নাম হীন
ঢেউয়ের সাথে আছড়ে পড়ে,
নিয়ে মুক্তো যত।
মায়ের মত আদর দিয়ে
মিটায় মনের ক্ষত।
অচেনা অচিন দ্বীপে
বড় হয়ে যেতে যেতে
তাই আবার মনে মনে
ফিরে যেতে চাই
সেই মেয়েবেলার হারানো স্মৃতিকোণে।।

মেয়ে তুমি মেয়ে না হয়ে মানুষ হও

কোয়েল ওঝা,
চতুর্থ সেমিস্টার, সংস্কৃত বিভাগ

কবে বলবে লোকে,
"ও মেয়ে তুই পাঠশালাতেই বেশি মানানসই।"
মেয়ের বয়স অষ্টাদশী হতে না হতেই,
মায়েরা দেয় তাদের হাতে খুন্তির হাতল।
কেন বলে না তারা
"তুমি উচ্চ শিক্ষাতেই পা বাড়াও"
পৃথিবীজুড়ে লড়ছে কত মেয়ে,
তাদের উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার আশায়।
গড়ছে তারা নতুন প্রজন্ম,
কিন্তু তাদের জীবনে নেই কোন পরিবর্তন।
মেয়ে একবিংশ ছুঁতে না ছুঁতেই,
তাদের বিবাহ দিতে ব্যস্ত সকলে।
জন্মের পর তারা শুনেছে, পরের ঘরে নাকি তাদের ঘর
আর পরের ঘরে গিয়ে শুনেছে, ওটাই শ্বশুরবাড়ি
তাহলে কোনটি মেয়ের আসল ঘর সেইটি বলে দাও...
নারী শিক্ষা নিয়ে করো এত বড়াই,
কাব্য লেখ টাইমলাইন জুড়ে,
এটা কি কেবল লোক দেখানো।
কই কেউ তো বলে না,
"মেয়ে তুমি মেয়ে না হয়ে মানুষ হও"
নারীকে আশীর্বাদ করার সময়,
"তার একটা সুন্দর সংসার হবে" এইটা না বলে,
যদি বল "ও মেয়ে তুই ভাল করে লেখাপড়া কর।"
সেইদিন বাস্তবে হবে নারী শিক্ষার প্রসার।।

"United we stand, Divided we fall"

দাবি

সৌরভ দে

শিক্ষক, সংস্কৃত বিভাগ

পাইনি যেসব জীবনেতে, তা নিয়ে আজ ভাবি
অনেক কিছুই পাওয়ার ছিল, করিনি তো দাবি।
করলে দাবি, পেতাম কিনা, ছিলোনা তাও জানা,
হয়তো পেলে, উশুল করে,
নিতাম ষোলোআনা।
ভাগ্যে যদি থাকে, তবে করতে হয়না দাবী,
পাওয়ার হলে, এমনিই পেতাম
এটাও আবার ভাবি।
কপালে যা আছে লেখা,
সেটুকু পাবো জানি,
যে যাই বলুক কপালটাকে
আমি ভীষণ মানি।।

ফেসবুক

মহেশ্বর ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় বর্ষ

ফোন নিয়ে করছে সবাই ফেসবুক
পড়ে আছে সাধারণ সেই বুক।
তাদের মাথায় পড়েছে বজ্রাঘাত,
কাছের লোক মনে পায় আঘাত।
ভালো ভালো ছেলে গুলো যাচ্ছে উচ্ছন্ন
তোমরা কি তা জানো ?
ফেসবুকেতে হচ্ছে প্রেম, হচ্ছে বোঝাপড়া,
তাদের মধ্যে হচ্ছে এক মিথ্যা গল্প গড়া।
রাত আরো বড় চাই,
রাত শেষ হবার আগেই
গুড মর্নিং জানাই।
সারাদিন ফেসবুক করে কাটিয়ে দিই বেলা,
বাড়িতে পায়না আদর, পায় সে অবহেলা।
তাই আর করব না ফেসবুক,
পড়বো এবার সেই সাধারণ বুক।

নিশ্চুপ গোধূলি

দোয়েল হালদার

দিন শেষে লুকিয়েছে ক্লান্ত দিবাকর,
দূরের ওই সবুজ বনের আড়ালে।
চারিদিকে থেমে এসেছে কোলাহল,
পাখিরা আসিয়াছে ঝাঁকে ঝাঁকে আপন বাড়ি ফিরিবারে।
চারিদিকে সবুজে ভরা পৃথিবী, তারই
মাঝে মোর ছোট্ট গ্রাম
বিকেল শেষে মাঠে আসিয়া বসি,
জুড়াইবারে প্রাণ।
লাল-নীল আকাশে ভেসে আসিয়াছে
রক্তমাখা গোধূলির সেই অপরূপ আলো।
সোনালী আলোকে আড়ালে রেখে
কহিয়া চলিতেছে এবার প্রদীপ জ্বালো।
মাঠের কোনায় বসিয়া অপরূপ চিত্তে চাহিয়া দেখি,
পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছে অপর প্রান্তে,
সাথে শুকতারাটি।
কি অপরূপ এই সৌন্দর্য, কি নিদারুণ অনুভূতি
ফকির কহে বোঝাইবো কোন ভাষায়,
কেমনে করি,
মৃদু বাতাসে দুলিয়াছে ধানের কোমল শিস,
মুষল ধরে বাঁধানো জল, পূর্ণিমার আলোয় করে চিঁকচিঁক।
মোর পাশে থাকা ঘাস ফুলটি দুলিয়ে দুলিয়ে কহে-
ওহে মানব! সৌন্দর্যের বিলাস ভবানী!
তোমরা সৌন্দর্য্য বজায় রাখতে শেখেনি।
যারে আজ কহিয়াছ এতো কিছু
সময় এলে মাড়িয়ে দিতে লাগিবে না
দ্বিধা টুকু।
হঠাও থমকে দাঁড়াইয়াছে মোর ভাবনা
সত্যিই, মানব ধ্বংস করিবার করেনা পরোয়া।
মনে মনে প্রশ্ন জাগে তারে কহিতেও দ্বিধা লাগে।
এ যুগে সকলেই হয়ে উঠেছে প্রকৃতি প্রেমী
তবে ক-জনই বা প্রকৃতি রক্ষাকারী ?

মা

অয়ন মন্ডল, *দর্শন বিভাগ,দ্বিতীয় বর্ষ*

মা গো মা, তুমি আছো কতো দূরে,
তোমায় দেখতে না পেলে মনটা কেমন করে
সূর্য যখন সকাল বেলা,
আলো নিয়ে আসে
মুখটা তোমার মনে পরলে
মনটা যেন হাসে।
আমি আছি অনেক দূরে।
তুমি আছো কোথায়?
তোমাকে ছুঁতে না পেয়ে
মনটা আছে ব্যাথায়
ছোটোবেলার খেলাধূলা
সবেই মনে পরে
সঙ্গে তোমার স্নেহের শাসন
থাকবে জীবন জুড়ে।
সন্ধ্যে বেলায় বাড়ি ফিরে
আকাশ পানে দেখে
মনে মনে শুধু ভাবি
আমার কেহ নাহি।
মা, তুমি আমার হাঁসি
তাই তোমায় আমি
এতো ভালোবাসি।।

"সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"

মা

দূর্বা কর্মকার, *দর্শন বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ*

মা গো আমার মা আমি তোমার ছোট্ট মেয়ে,
দুচোখ আমার আঁধার দেখে তোমারে না পেয়ে।
তুমিই আমার মুখের হাসি,
তোমায় বড্ড ভালোবাসি।
তোমার জন্যই দেখলাম আমি এই পৃথিবীর আলো,
তোমার মতো কেউ তো মাগো রাখে না যে ভালো।
এমন করেই থেকো মাগো আমার ছায়া হয়ে,
জনম জনম হতে চাই আমি তোমার ছোটো মেয়ে।।

শান্তির ভোর

প্রিয়াঙ্কা

চলো শান্তির রাজ্য পুনরুদ্ধার করি।
অশান্তি, অশুভ যা কিছু নিপাত করি।
আজ হিংসা বিভেদের প্রাচীর ভেঙে,
হৃদয়ে কুঠিরে শান্তি পাক
সোশ্যাল ডিসটেন্স অনেক হলো।
এবার সবাই একটু কাছে আয়,
ধর্মের মরা গঙ্গা পাক,
এইখানে তার জায়গা নাই।
বোমা পিস্তলে যুদ্ধ জয়,
আর তো এমন সম্ভব নয়।
অস্ত্রের গান গাইব না ভাই
অস্ত্রকে আজ পাবো না ভয়।
শিশুর মুখে খাদ্য নেই বস্ত্র নেই,
এর রাজ্যে শান্তি ফিরুক,
শুনবো শিশুর কলরব।
শান্তির রাজ্যে পুনরুদ্ধার
হবেই জানি আসছে ভোর।
একসাথে সব বাধবো ঘর
এক সূত্রে বাধবো ভোর।

জিজ্ঞাসা

সোমা মাজী

বাংলা বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ

শরতের সাদা মেঘ আর শিউলির গন্ধ
সবার মনে আনে পূজার আনন্দ।
মহালয়ার শুভারম্ভে দেবীপক্ষের সূচনা
চারিদিকে শুরু হয় নারীশক্তির আরাধনা।
নারী কী সত্যই পূজনীয়?
তাহলে গভীর অন্ধকারে
কেন ভেসে আসে নারীদের আর্তনাদ ?
কেন শোনা যায় কন্যা ভ্রূণহত্যার কথা ?
বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা হয় লক্ষীর আসন
আবার সেই বাড়ীতেই চলে বধূনির্যাতন ও শোষন।
লক্ষীপূজার পর কালিপূজার রব
দীপাবলী হলো আলোর উৎসব।
কালোরূপেই কালি সবার কাছেই পূজিত
তবে কেন কালো মেয়েকে সর্বত্র করো বঞ্চিত ?
বদল ঘটছে অনেক কিছুর
বদল ঘটছে সমাজের
বদল কি ঘটবে না
মানবিকতার ও মানসিকতার ?

ব্যাধি

সোনেল মাজী, *বাংলা বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ*

দিনগুলো সব ভালোই ছিল
ছিলাম আমরা বেশ।
হঠাৎ করে করোনা এসে
করল আমাদের শেষ।
বিশ্বজুড়ে এই মহামারী
চারিদিকে ভয়।
কি করে এবার বাঁচবো সবাই-
মৃত্যুকে করবো জয়।
দেশে দেশে করোনায়
মরছে হাজার হাজার।
আতঙ্ক আর দুশ্চিন্তাই
হচ্ছে এখন সবার।
করোনা যে মারণ ব্যাধি
একা একার লড়াই।
মাস্ক পরা আর হ্যান্ড ওয়াশ
ছাড়া করার কিছু নাই।
অবশেষ ভ্যাকসিন এল
কাটল ভয়ের রেশ।
এবার বুঝি করোনার হবেই হবে শেষ।।

গুরু

শুভম মন্ডল, *বাংলা বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ*

বাংলা ভাষায় প্রথম শিশুর
উচ্চারণ হয় মা,
প্রথম শিশু হাঁটতে শিখে
এগিয়ে দিয়ে পা।
শিশু মুখে মৃদু স্বরে আধো আধো বলা।
হামাগুড়ি দিয়ে শিশুর প্রথম
পথ চলা।
মায়ের কোলে মাতৃ ভাষা
বাংলা ভাষা শেখা গুরুর কাছে হাতে খড়ি
বারবার বুলিয়ে লেখা।
হাতে খড়ি দিয়ে শিশুর
শিক্ষালাভ শুরু,
শিক্ষাদান করেন যিনি তিনিই শিক্ষা গুরু।
মালির মতো বীজকে করে
রক্তে পরিণত,
শিক্ষাগুরু পূজ্য তাই
পিতা মাতার মতো।

প্রণাম নিও

রাকেশ পরামাণিক, *দ্বিতীয় বর্ষ*

তোমরা পড়াও, তোমরা শেখাও
তোমরা বোঝাও কেমন করে,
শিক্ষা এবং শৃঙ্খলাতে
আমরা নেব জীবন গড়ে।
মনের মাঝে যত্নে করে
তোমরা ছড়াও জ্ঞানের আলো,
কেমন করে কথায় কথায়
দাও চিনিয়ে মন্দ ভালো।
আমরা কোথাও ভুল করি যেই
ঠিকটি চেনাও তোমরা এসে,
ভয় যদি পাই সে ভয়টাকেও
দাও সরিয়ে এক নিমেষে।
তোমরা আলোর স্বপ্ন দেখাও
তোমরা পরম পূজনীয়,
আমার যত শিক্ষাগুরু
সবাই আমার প্রণাম নিও।।

গৃহবন্দী

প্রীতি সিংহ

কবে আর আসবে সময়
কবে আর বুঝবে বলো
তোমার আমার গৃহবন্দী হওয়ার বার্তা
কেন জারি হল ?
স্তব্ধ সভ্যতার চারিদিকে যেন মস্ত প্রাচীর
চেয়ে দেখো বিশ্বজুড়ে চলেছে এই মৃত্যু মিছিল।
করোনা ভাইরাস আজ
চিকিৎসা বিজ্ঞানকে যেন করেছে পরিহাস
নতুন করে লেখা হবে মরণের এই ইতিহাস।
বাজার হাট রেশন দোকান সবখানেতেই
জমায়েত হচ্ছে মানুষ।
মানতে চাইছে না সামাজিক দূরত্ব,
এখনো কি বোঝেনি এই রোগের গুরুত্ব।
তোমার জন্য লাটে উঠেছে বিশ্ব বাজারের অর্থনীতি
শয়ে শয়ে বাড়ছে লাশ, হচ্ছে শঙ্কা বাড়ছে ভীতি।
লাশের উপর লাশ, বাড়ছে মনের ভয়,
প্রতিনিয়ত সতর্ক থাকুন, আতঙ্কে নয়।
থাকলে সুস্থ, করোনামুক্ত হবেই দেখা ভবিষ্যতে
আবার সবাই মিলব আমরা এই সুন্দর পৃথিবীতে।
করোনা ভাইরাস হোক তোর সর্বনাশ,
আবার বাজুক খুশির ঢাক,
সঙ্গে উলুধ্বনি আর শাঁখ।

"গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু দেব মহেশ্বরঃ..."

স্বামীজীর সম্মুখে

সোনিয়া সিংহ, *তৃতীয় বর্ষ, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ*

নমি নমি স্বামীজি তোমায়
শতকোটি নমি।
হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা দিয়ে
তোমারে শুধু নমি।
মাতা ভুবনেশ্বরী পিতা বিশ্বনাথ
তুমি মোদের কাশির সেই বিশ্বেশ্বর নাথ।
বিশ্বেশ্বর থেকে বিলে হলে
পরে বিবেকানন্দ।
সারদার কাছে শিক্ষা
তোমারি মত কর মোরে।
এইটুকু মোর ভিক্ষা
নতজানু হয়ে করি প্রার্থনা।
করো আশীর্বাদ
পূর্ণ হোক মোর মনের বাসনা
এইটুকু মোর সাধ।

করোনা

শান্তনু তন্তুবায়, *ভূগোল বিভাগ*

একটা সময় ভালোই ছিলাম, ছিল না কোন জ্বালা।
হঠাৎ করে এল করোনা, জীবন করলো
ঝালাপালা।
শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সবাই কাবু এই রোগে।
সবাই ভাবে এবার হয়তো যাবো মায়ের ভোগে।
বিশ্ব আজ স্তব্ধ, মানুষ কাঁদে, কষ্টে আর
ভগবান হাসছে আজ, পাপের ফল পাবে।
মানুষজনের নেইকো কাজ, পাচ্ছে না আজ খেতে,
আর রাজনীতিতে দেশটা গেল, টাকা গেল পেটে।
ডাক্তার নার্স সবাই ভাবে, বাঁচবো কি আর মোরা ?
আর মানুষ ভাবে সবকিছু ভগবানের খেলা।
সৃষ্টির যেমন ধ্বংস হয় আমরা সবাই জানি
এই করোনাও যাবে একদিন আমরা সেটাও মানি।
রাতশেষে ঠিক যেভাবে দিন ফিরে আসবে,
ঠিক তেমনি বিশ্ব আবার মনের সুখে হাসবে।।

নারী

তনুশ্রী কুন্ডু, *সংস্কৃত বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ*

কষ্ট পেলেও কাঁদা বারণ
কারণ তুমি নারী।
ক্লান্ত হলেও হাসা বারণ
কারণ তুমি নারী।
নিজের ইচ্ছায় জন্ম বারণ
কারণ তুমি নারী।
পুরুষ পড়লেও তোমার পড়া বারণ
কারণ তুমি নারী।
এত কিছু শোনার পরেও আমি নারী,
আমায় ভাঙতে এলে
ভেঙে দেখাতেও পারি।।

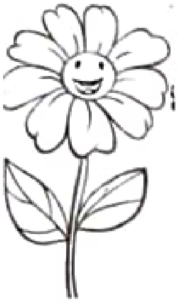

ক্রিকেটার বিরাট কোহলি

রাহুল ঘোষ

ভারতের গর্ব তুমি বিরাট
তুমি যেন রান করার মেশিন।
তিনি করেছেন অনেক রেকর্ড অধিকার,
তাইতো তিনি ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন অধিকারী।
তিনি দেশের জন্য করে চলেছেন লড়াই,
কঠিন কঠিন ম্যাচ কে তিনি করেছেন বিজয়ী।
তিনি দেশের জন্য এনেছেন শত শত পুরস্কার,
তার ক্লাসিক শর্ট দেখে ফ্যানরা হয় পাগল।
তেমনি তার স্টাইল লুক দেখে মেয়েরাও হয় পাগল,
তাই সারাবিশ্ব তাকে কিং বলেই জানেন।
তিনি যখন করেন রান,
সব বোলাররা হয় হয়রান।
তখন দেশবাসী গায়ে জয়ের জয়গান।
ক্রিকেটের ক্লাসিক যেন তারই কাছে সৃষ্টি,
তাই তো থাকবেন ক্রিকেট দুনিয়ায় চিরজীবী।
ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে বিরাট কোহলি কে পেয়ে আমরা ধন্য
বিরাট তুমি শুধু দেশের নয়, বিশ্বের মহান।
তোমাকে সারা জীবন আমরা করব সম্মান।।

সব দুর্গাই থাকুক সুখে

পূর্বাশা পাণ্ডে, *তৃতীয় বর্ষ, সংস্কৃত বিভাগ*

এক দুর্গা রিক্সা চালায় কোচবিহারের হাটে
এক দুর্গা মাটি কাটে একশো দিনের কাজে
এক দুর্গা রাস্তা বানায় পিচ ও পাথর ঢালে
এক দুর্গা রোজ চুনো মাছ ধরছে বিলে-খালে
এক দুর্গা করছে মাঠে দিনজুরের কাজ
এক দুর্গা খিদেয় কাঁদে, পায়নি খেতে আজ
সবাই জানি, এদের কারো হয়না কোনও পূজো
এরা তো মা তোমার মতো নয়কো দশভূজো
সব দুর্গার চোখে-মুখেই ফুটবে হাসি কবে?
মাগো, তোমার পূজো সেদিন সত্যি সফল হবে।

এক দুর্গা পাথর ভাঙে রোজই আসানসোলে
এক দুর্গা পেটের জ্বালায় খনিতে কয়লা তোলে
এক দুর্গা সাত-আট বাড়ী কষ্টে মাজে বাসন
এক দুর্গা কারখানাতে ব্যস্ত নানান কাজে
এক দুর্গা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেই সারায় ছাতা
সবাই জানি, এদের হয়না কোথাও পূজো
তাই বলি মা, এদের চোখেও পূজোর খুশি খুঁজো
সব দুর্গার চোখে-মুখেই ফুটবে হাসি যবে
মাগো, তোমার পূজো সেদিন সত্যি সফল হবে।

মিষ্টির লড়াই

বৃষ্টি চট্টরাজ, *দ্বিতীয় বর্ষ,* **ইংরেজী বিভাগ**

রসগোল্লা বলেই শোনো আমি তোদের সেরা
বড্ড বাজে বকিস কেন বলে ওঠে পেড়া
বোঁদে বলে ছোটো হলেও আমি ভারি মিষ্টি
ল্যাংচা বলে হায় হায় একি অনাসৃষ্টি
জিলিপিরা বলে হেঁকে আমি তোদের সেরা
আমরা আছি কেন ভুলিস বলে খাজা গজা
রাজভোগ বলে তোরা ঝগড়া করিস কেন?
আমরা সবাই ভাই ভাই সেটা ভুলিস কেন
একই সাথে যেতে হবে মানুষের পাতে
ঝগড়াঝাঁটি বন্ধ কর নিজেদের সাথে।

বিদ্যালয়

সুজাতা পাল

বিদ্যালয় বিদ্যালয় খুলবে তুমি কবে ?
তোমার খোলার সময় হলে অনেক মজা হবে।
তোমার ক্লাসে পড়ব বই, লিখবো খাতায় কত
তোমার কাছে এলে সবাই গল্প করে যত।
শিক্ষকেরা পড়ান যখন ছাত্ররা সব হই-হট্ট করে
পড়ার ধরার সময় তারা অন্যকে জিজ্ঞাসা করে।
শিক্ষকেরা এমন দেখে যদি মারতে আসে তাকে
ছাত্রের এসব বলে উঠে দেখবেন ডাকবো বাবাকে?
পড়ার সময় যত গল্প, বিরতির সময় ফাঁকা
আর ক্লাসের পড়া না করলে সে হয় খুব বকা।
ক্লাসের সব পড়া করলে পাবে দশে দশ
দশে দশ না পেলে ভবিষ্যতটা হবে লস।।

১৫ই আগষ্ট

মৌমিতা লায়েক, *দর্শন বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ*

আজকে মোরা এসেছি এই স্বাধীন পতাকা তলে,
অর্জিল ইহা কতশত বীরে নির্দয় বাহু বলে
ভুলি নাই মোরা বাপুজীরে আর মহান নেতাজী বীরে,
যাদের প্রশান্ত চেষ্টায় দেশ হয়েছে স্বাধীন ধীরে।
দিল যে রক্ত দেশের ভক্ত প্রাণ দিল সব উজাড়ি,
ক্ষুদিরাম, বাঘা, বিনয়, বাদল, দীনেশকে লইল কাড়ি।
আরও কতশত গননে না যায় সন্তান ভারত মা-র,
কারো ফাঁসি হল কেহ বা পুড়িল কারো বা দ্বীপান্তর।
শৃঙ্খল মোচন করিল মার মুখেতে ফোটালো হাসি,
প্রবল ইংরেজ ছাড়িল যে দেশ মুখেতে মাখিয়া মসী।
স্বাধীন রাষ্ট্র ভারতবর্ষ দিল যারা সেদিন আনি,
আজি এ প্রভাতে ফুলে আর মালাতে তাদেরইতো মোরা মানি।
স্বাধীন দেশের নাগরিক মোরা আজ পতাকা তলে,
স্মরণ করি স্বর্গত বীরে ফুল মালা শতদলে।
সামনে চড়াই ভয় কিরে ভাই এ চড়াই যাব পেরিয়ে
বাজিয়ে ভেরী বাধা দূর করি সামনে যাব এগিয়ে।
আমরা আজি এই পৃথিবীর নূতন যুগের যাত্রী,
ভয় করি না বিপদ ভরা আঁধার কালো রাত্রি।
অহিংসা, প্রেম, ভ্রাতৃত্ব ভাই আর যে ভালোবাসা,
আলোর পথে নিয়ে যাবে এই তো মোদের আশা।
দূর করব ওরে আছে যত আঁধার রাতের কালি,
জীবন দিয়ে রাখব ওরে জীবন প্রদীপ জ্বালি।

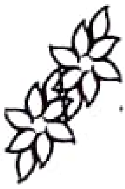

অন্ধকারে আলো

মল্লিকা ওঝা, *তৃতীয় বর্ষ, সংস্কৃত বিভাগ*

সকাল গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে রাত
হয়ে গেছে চারিদিকে অমাবস্যার আঁধার আকাশ।
হারিয়ে গেছে তারার ঝিলিমিলি চাঁদের জোছনা
অন্ধকারে একা আমি সহ ভয় ডর যতনা।
কোথাও কেউ নেই ভয়ে ভয়ে ভাবি
অন্ধকারের মাঝে শুধু আমি একাকী।
কখন হবে ভোর ফুটবে রবির আলো ?
আঁধার পেরিয়ে যাবে রাতের কালো।
কখনো ফুটবে কি দিনের আলো হবে নাকি ভোর ?
তাহলে কি রয়ে যাবে ভয়ের অন্ধকারের ঘোর ?
ভয়ে হঠাৎ চোখ খুলে দেখি কেটে গেছে কালো
রাত গড়িয়ে সকাল হয়েছে চারদিক হয়েছে আলো।।
ঘুচলো না তবুও মনের গ্লানি, মনের কালো।
জ্ঞানের ছোঁয়ায় বুঝতে পারি বিদ্যা সর্ব আলো।
বিদ্যার জ্ঞানে জগৎ আলো, ঘুচে যায় মনের আঁধার।
কিবা দিন কিবা অন্ধকার।

শারদীয়া

আবির কুমার মাঝি, *দ্বিতীয় বর্ষ*

মা আসছেন বাপের ঘরে,
পুজোর বাজনা বাজছে দূরে।
ঢাকের বাদ্য, ঘণ্টাধ্বনি,
কাশের বনে জয়ধ্বনি।
শরতের আকাশে মেঘের খেলা,
শিউলি আর কাসের মেলা।
শীতের ছোঁয়া অঙ্গে লাগে,
সবার হৃদয়ে পুলক জাগে।
আগমনীর গান উঠল গেয়ে
শিশিরভেজা নতুন ভোরে।
শারদীয়ার বার্তা পেয়ে,
প্রকৃতি যেন জেগে উঠে।
মেতেছে সবাই রঙিন সাজে,
পুজা এলো বাঙালির ঘরে।

---

*'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে জাতের কিরূপ
দেখলাম না এ নজরে।।'*

বিশ্ব বিজয়ী বীর

সুজাতা পাল

হে বিশ্ব বিজয়ী বীর,
কোথায় তোমরা কোথায় ?
ফিরে এসো আবার এক নতুন রূপে
এই ভারতবর্ষের অরাজকতার দেশে।
হে বিশ্ব বিজয়ী বীর,
তোমাদের চরণে দিই শতকোটি প্রণাম
তোমাদের প্রতিভাকে আমরা করি সম্মান।
ফিরে এসো এক সংগ্রামী রূপে
ভারতবর্ষের অরাজকতার দেশে।
হে বিশ্ব বিজয়ী বীর,
তোমরা দিয়েছো এক পূর্ণ স্বাধীনতা।
সেই স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে রাজনৈতিক অরাজকতা,
ফিরে এসো মানুষের মনে সমস্ত দ্বিধা দূর করে
আবার গড়িব জগত আমরা সকলে মিলে।।

মা

দুবরাজ গড়াই

বাংলা বিভাগ অনার্স তৃতীয় বর্ষ

মায়ের মত আপন জন
পাবে না কোথাও কোনোক্ষন
জয়ী করলে মায়ের মন
বিশ্ব আমার সারাক্ষণ।
আমার যখন জন্ম হল
কেঁদে উঠলাম উঁ আ করে
আবার আমি হেসে উঠলাম
পেলাম মায়ের ছোঁয়া।।
বাবা বলে সোনা আমার
মা বলে হিরে।
বড় আমি হয়েছি
মা বাবার স্বপ্ন ঘিরে।
মা যখন করে আদর
হৃদয় ভরে মায়া সারা জগৎ
মা বলে হাসি আমি
মা বলেই কাঁদি।
মায়ের মাঝেই থাকি আমি
মাকে পাশে রাখি আমি।
মা-ই আমার গুণীজন
মা ই আমার সর্বজন।।

খেলাধুলা স্বাস্থ্য ও শিক্ষা

নিশা ধীবর, *ভূগোল সাম্মানিক*

শরীর নিরব করতে চাও
সকাল-বিকাল মাঠে যাও
শুধু মোবাইল, শুধু গেম, শুধু কম্পিউটার নয়
সবসময় শুধু মাথাটাকে ঘামানো নয়
শরীরকে ঠিক না রাখলে রে ভাই বাড়বে শুধু ভয় আর উদ্বেগ
পড়ার সাথে খেলা আর খেলার সঙ্গে আছে পড়া
শুধু নয় মানসিক, চাই বেশি করে শারীরিক বিকাশ
তাই চর্চা ও অনুশীলন বেশি করে দরকার
খেলায় আছে মান সম্মান, আছে শরীর নীরব হওয়ার চাবিকাঠি
খেললে তাই ভালো হবে শারীরিক গঠন- হবে মনের সুষ্ঠু চাষ
যার ভর দিয়ে গড়ে উঠবে তরুণ প্রজন্ম,
গড়ে উঠবে নব নব আশ্বাস।।
অলিম্পিকের মাঠে এখন ভারতীয় শুভক্ষণে নিয়েছে কীর্তির পদক
পদকের গন্ধে ভারতবাসীর খুশির অনুরণন
গোটা বিশ্বে কাছে মান রেখেছে ভারতের তরুণ-তরুণী অলিম্পিয়ানরা
তাঁদের গর্বে আমরা সকলে গর্বিত-মনোহর ভারত ও বসুন্ধরা
তাঁদের প্রেরণা গোটা ভারতের তরুণ সমাজের
এই ধারা যেন বজায় থাকে চির অমলিন ভারতের।
খেলাধুলা স্বাস্থ্য শিক্ষা এই ধারার মহামিলনে
সুন্দর হয়ে উঠবে পৃথিবী
আমরাও আনন্দময় এই ভারত ও ভুবনে।।

নারী

সোনালী গরাই

কষ্ট পেলেও সহিতে হয়েও
সব পারে নারী।
শত শত পরিশ্রম করেও
নিজের জন্য যার সময়
থাকেনা সে হচ্ছে নারী।
নিজের ইচ্ছা পূরণ বারণ
কিন্তু অন্যের ইচ্ছাপূরণে
সাহায্য করে সে হচ্ছে নারী।
পুরুষ জন্ম সব পারে
পারেনা শুধু এই নারী
এত সব জানা-শোনার
পরেও এই নারী অপরাজেয়।
কোন নারীকে ভাঙতে এলে
ছোট করতে এলেও ভেঙ্গে
দেখাতেও পারে নারী।

নিষ্ঠুর রে বাইশে শ্রাবণ

জয়দেব ঘোষ

ভূগোল বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ

মহানগরীর রাজপথে হতে গলি সেই দিনের সেই শোকাচ্ছন্ন মানুষের প্লাবন
তুমি কেড়ে নিলে কোভিদ প্রাণ, নিষ্ঠুর ও বাইশে শ্রাবণ।
সেদিনের সেই চির নিদ্রায় গেলে
আমাদের বিশ্বকবি চির নিদ্রায় তুমি গেলে চলে
তুমি নির্মম বাইশে শ্রাবণ, বাঙালি হৃদয় কোলে
তুমি শুধু সে দিনের একা শুধু ছেলে সাক্ষ্যদানে।
স্তব্ধ তরী, নতমস্তকে মাঝি, নীরব বিহঙ্গ সব যত,
দারুন আঘাত কাপে, অকাতরে তারাগুলি, চাঁদ সূর্য যেন শোকাহত।
সেই দিনে ময়ূর ময়ূরী পেখম তুলে
গেছে ভুলে, নৃত্যতালে শ্রাবণ ধারার বুকে,
বুঝি কোহেলির কুহু কুহু রব
থেমে গিয়েছিল সেদিনের শোকে।
ছায়াঘেরা ছাতিম তলায় আর
শোনা যাবে না যে আর তার কবিতার সুর,
বাইশে শ্রাবণ তুমি এত নির্মম
তুমি এত কেন নিষ্ঠুর!
তিনি বলে গেছেন, 'মরিতে চাহিনা আমি'
এমনই আকুতিভরা যার আবেদন,
তুমি কেড়ে নিলে, তুমি এত নিষ্ঠুর, এত তুমি নির্মম।
কে দেবে জবাব দিহি অগণিত মানুষের মাঝে
ওগো নির্মম বাইশে শ্রাবণ
কোন অধিকারে তুমি নিলে কেড়ে
মহামানবের মহান জীবন
উত্তর দাও গণ দরবারে
তুমি হে বাইশে শ্রাবণ।

* * *

মেঘলা বেলা

রুমকি চক্রবর্তী

মেঘলা বেলা আকাশ-পাড়ে
মেঘ বৃষ্টির খেলা
মনটা যেন মেঘ বলাকা
ইচ্ছে ডানা মেলা।
শীতল বাতাস বইছে বাতাস
বড় এলোমেলো
আজকে দিনে মনটা আমার
লাগছে ভীষণ ভালো।
কচি পাতায় লাগছে বাতাস
দুলছে শিমুল পলাশ।।

* * *

যাত্রী

রৌনক গোস্বামী

তৃতীয় বর্ষ, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ (প্রোগ্রাম)

খেয়া ঘাটে ফিরছে তরী
পার হবি কে আয়।
খেয়ার মাঝি ডাকছে
তোরে আজ এই অবেলায়।
দিবস এখন বিদায় নিল
সন্ধ্যা এলো বলে।
খেয়ার ঘাটে ভিড় লেগেছে
যাত্রী দলে দলে।
আঁধার যদি নেমে আসে
পথ পাবিনা খুঁজে।
থাকতে আলো পার হয়ে যা
থাকিস না চোখ বুজে।

❐ **কবিতা**

শারদীয়া

মনীষা সিংহ, *দ্বিতীয় বর্ষ, ইংলিশ অনার্স*

বাজলো যে আগমনী সুর
ঢাকে পড়ল কাঠি
আবার হবে মহা উৎসব
শারদীয় জমজমাটি।।

ভোরের ওই মহালয়া
জানান দেয় মায়ের আগমন
মা আসবে বাপের বাড়ি
সাথে চার সন্তান ও তাদের বাহন।।

ধনী-গরিব নির্বিশেষে
উঠবে সবাই আনন্দে মেতে
মায়ের পুজোয় হইহুল্লোড়
করবে সবাই মন্ডপেতে।
পুজোর এই চারটে দিনে
খুশির থাকেনা অন্ত
পেঁজা মেঘ আর কাশের দোলায়
হাসে দিক-দিগন্ত।।

ষষ্ঠীতে মায়ের বরণ
হয় বোধনের সূচনা,
নিত্যনূতন সাজে এবার
হবে মায়ের আরাধনা।
সপ্তমীতে আসে কলা বউ
তার সঙ্গে নবপত্রিকা স্নান,
অষ্টমী আর নবমীতে-
সন্ধিক্ষণ ও হয় বলিদান।।
তারপর আসে বিজয়া দশমী
মা করবে কৈলাস গমন
সিঁদুর খেলা ঢাকের তালে
মায়ের হবে বিসর্জন।।
বিজয়া প্রণাম ও কোলাকুলিতে
শ্রদ্ধা-ভালোবাসার হয় আদান-প্রদান
বছর বছর মেতে উঠুক-
শারদীয়ায় বাঙালির মন প্রাণ।।

শকুন্তলা

কাবেরী গরাই, *সংস্কৃত বিভাগ*

ত্রিভুবনে বিরল, এই সুন্দরী শকুন্তলার মতো
রূপে তিনি অদ্বিতীয়া তিলোত্তমা।
কম্ব মুনির আশ্রমে পিতৃস্নেহে পালিতা
জন্মসূত্রে অপরূপা লাবণ্যময়ী শকুন্তলা।
নব যৌবন সম্পন্না, স্বভাব সরল-শান্ত
এই শকুন্তলা কে বলে প্রকৃতির আরেক অংশ।
মুনিকন্যা রূপ দেখে বিমুগ্ধ
রাজা দুষ্যন্ত হয়েছেন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট
দুষ্যন্ত শকুন্তলার বিয়ে হল গান্ধর্ব মতে,
বিয়ে করে রাজা ফিরে গেলেন রাজধানীতে।
বিবাহের পর শকুন্তলার পতিহৃতা প্রাণা,
স্বামীর চিন্তায় তিনি মগ্না।
অন্যমনা শকুন্তলা করে সমাজের কর্তব্য লংঘন
ক্রুদ্ধ দুর্বাসা মুনি করেন তাকে অভিশাপ ভাজন।

❒ **কবিতা**

মা

সুতপা মাজী
তৃতীয় বর্ষ

মা যে আমার সবার প্রিয়
মা যে শুধু মা
মায়ের সাথে তাইতো কারো
হয়না তুলনা।।
মা যে আমার জগৎ মাতা
মা যে সবার সেরা।
মা ছাড়া ভবে ভুয়ো সবই
মা ছাড়া দিশেহারা।।
মা যে আমার আনন্দময়ী
মা যে জগদ্ধাত্রী
মায়ের ভালোবাসার চেয়ে
আর কিছু নেই তো দামী।
মায়ের খেলে পরে
দুঃখ যায় যে সব ভুলে
মা যে শুধুই মা
তাই মায়ের সাথে হয়না
কারোর তুলনা।।
মা আমার মা
মা ছাড়া কিছুই যে
আর ভালো লাগে না
তাই তো সে মা।।

আগমনী

দেবলীনা মন্ডল,
বাংলা বিভাগ

পুজো মানেই মনের ভিতর
দারুণ উথাল পাতাল
পুজো মানেই মিষ্টি সাজে
বৃষ্টি ভেজা শরতের আকাশ
শিউলি ফুলের গন্ধ
মা আসছে আবার ঘরে
পুজোর বাঁশি বাজছে দূরে,
মা আসছে বছর ঘুরে
শিউলির গন্ধে আগমনি
ঢাকের শব্দ, শঙ্খধ্বনি
ছড়িয়ে দিতে শান্তির বাণী,
মুছে যাক জরা-ব্যাধি
মুছে যাক গ্লানি
সব দুঃখ মুছিয়ে দিয়ে
ঘুচিয়ে দিও ক্লান্তি।
ফেরাও সুমতি,
সবার হাতে দাও না লিখে
সুখের নিয়তি।।

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী'

অনুরোধ

সাথী সিংহ *(তৃতীয় বর্ষ)*

তুমি জন্মেছো যে মায়ের কোলে
তাকে কখনো বৃদ্ধা বলো না।
কালো সে তো সৃষ্টির আলো
তাকে কুৎসিত বলো না
তুমি জন্মেছো মৃত্যুর জন্য সে
কথা অস্বীকার করো না।
যে শিশু তুমি জন্ম দিয়েছো
তাকে অতি মায়ার জালে
বেঁধে রেখোনা।
আলোকিত ঝলমলে সকালে
মেয়ে মিষ্টি মধুর রাতকে ভুলে যেওনা।
আমি জন্মেছি যে মা
তোমার কোলে মাথা রেখে
আমি ছেড়ে চলে যাব না
মা তোমাকে কষ্ট দেবনা
কষ্ট দেবনা, কষ্ট দেবনা।।

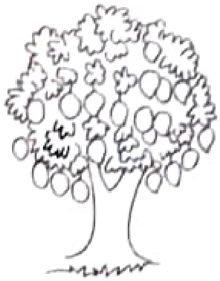

প্রাণের মাঝে গান

পায়েল উপাধ্যায়

বাংলা অনার্স তৃতীয় বর্ষ

গানই আমার জীবন
ওগো
গানই আমায় প্রাণ
সুরের তানে গানে গানে
মেতে ওঠে প্রাণ।
প্রাণে যদি না থাকে গান
তবে কী থাকে প্রাণ
প্রাণ ছাড়া গান যেন
সূর্য বিনা চাঁদ।
চাঁদ ছাড়া কী আকাশ মানায়?
ফুল ছাড়া কী গাছ ?
বসন্ত ছাড়া কি কোকিল মানায় ?
গাছের প্রতি শাখায়।
কেশ বিনা যেমন মানায় না রমণী
জল বিনা যেমন মাছ
প্রাণ ছাড়া তেমন
গানও পায় না
ভালোবাসার ঠিক দাম।
মনের মাঝে গানই বাজে
সারাদিন রাত মোর
গান ছাড়া জীবনটাকে
লাগে অবাক মোর
তাই তো বলি গান গেয়ে যাও
গানেই থাকো মেতে
সুস্থ সবল থাকতে গেলে
গানকে রাখো প্রাণে।।

আধ রাতের যৌবন

রমা মন্ডল, *বাংলা বিভাগ*, তৃতীয় বর্ষ

তোমাদের মতোই আমার দেহে যৌবন আসে
সমাহিত হয় রূপ, রস, রাগ
কিন্তু আসে না অলি, গায় না গান,
পাই না চুম্বন সুখ, হয় না আলিঙ্গন।
তোমাদের মতোই আমার দেহেও যৌবন ফুল ফোটে,
কিন্তু হয় না ফুলশয্যা, পাই না রতি সুখ,
হয় না দাম্পত্য কলহ।
তাইতো তোমাদের মতো আমার জন্য যেমন কাউকে
আত্মহত্যা করিতে হয় না।
মাঝ রাতের ভরা যৌবন আমার দেহ থেকে
বিদায় নিয়ে তোমাদের দুয়ারে যখন হাজির হয়।
তখন তোমরা তাকে পদ দলিত কর বলেই,
নাম বললে আমায় চিনবে,
আমি শেফালি,
ডাক নাম ''শিউলী।"

The Ultimate

SusantaSingha, *College Staff*

It starts with you and ends in you
The sun
That gives energy to all
The stars
that shine bright every night
the moon
that gives light to all
the flowers
that gives pleasure to eyes,
mind and heart.
The fruits
That meet the hunger
The air that is present everywhere
The want
That is priceless
But Birds
That make all cheerful
The tree
That teaches all to be patient
The River
That tells to move on in life.
Represents you, the only you
You, that ultimate
The never ending source.
Pleased to fall on earth
And
To get mixed with dust
At the end
And again waiting for
Another opportunity…

জীবন যুদ্ধ

জ্যোতি বাদ্যকর

তৃতীয় বর্ষ, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

ভয় নয়, ভয় নয়, এটাই জীবন যুদ্ধ
এই যুদ্ধে যতই আসুক বাধা।
যতই আসুক ঝড় মানবো না
এটাই জীবন যুদ্ধ
আমরা এক মুক্তসমাজ চাই।
কোন বেড়াজাল মানবো না
আমরা লড়ে যাব শেষ পর্যন্ত।
এটাই জীবন যুদ্ধ মানবো না মানবো না কোনো ব্যাধি।
করোনা করোনা এবার হার মানা বা হার মানবো না
এই মরণ সঙ্গে আমরা মানবো না।
আমরা মৃত্যুঞ্জয়ী করণা যুদ্ধে
আমরা হার মানবো না।

শিক্ষার্জন

মনীষা চ্যাটার্জী, দ্বিতীয় বর্ষ , শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

লেখাপড়া করে যারা
সকলের ভালোবাসা পায় তারা।
যদি জলে জ্ঞানের আলো
বিশ্বজনে তারা বাসবে ভালো।
সুশিক্ষার দরজাতে
চলো সবাই একসাথে।
নিরক্ষরতা যেদিন মুছে যাবে
সব অজ্ঞরাও জ্ঞান পাবে।
মনের কথা বিলিয়ে দিয়ে
গড়ব সমাজ সুশিক্ষা নিয়ে।
সুস্থ ভাবে বাচঁতে হলে করো শিক্ষার্জন
সমাজকল্যাণে জীবন সঁপে
কুসংস্কার করো বর্জন।

দুই রূপে বর্ষা

পায়েল মন্ডল, শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ

সারাদুপুর পরে নুপুর একটা মেয়ে নাচে
মৌটুসী যে একা বসে কদম গাছে।
জল থইথই উঠোনজুড়ে তুলছে নাচের ছন্দ
তোমায় আমায় করবে মাতাল কেয়া ফুলের গন্ধ।
নাচবে যখন শ্রাবণ ধারা সারা আকাশ বেয়ে
আমার মনে মেঘ বালিকা ধরবে দুচোখ জুড়ে।
আমি তোমায় নিয়ে লিখছি খাতার পাতায়
ওদের খোকন গরু চরায় বৃষ্টি নিয়ে মাথায়।
বৃষ্টি এলে তোমার মনের মত ময়ূর নাচে
ঘরে পাঁচটা প্রাণ জ্বলছে তপ্ত খিদের আঁচে।
এই জঠরে জন্ম নিল ধনী-গরিব সবাই
বেছে বেছে হচ্ছে কেন বস্তিবাসী জবাই।
আমায় যখন মত্ত করে কেয়া ফুলের গন্ধ
আশ্রয়হীন ওদের তখন হিসেবকড়ি বন্ধ।

ভাইরাস

সোনিয়া সিংহ, তৃতীয় বর্ষ,শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

মানুষের জীবনে আতঙ্ক,
আতঙ্কিত জীবনে
সমাজের মানুষ বলে উঠছে
করোনা কারো নয়।
রোগটা নাকি বড্ড ভারী
এবেলা ওবেলা মাস মাস
আমদানি চলছে
দেশে বিদেশে
গরিব মানুষগুলো
নয় সমাজের সচেতন
তাই তার হাত থেকে বাঁচতে
পারবেনা এই জগতে
করোনা করছে গ্রাম উজাড়
মরছে মানুষ হাজার হাজার।

“শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই”

ধ্বংস যজ্ঞ

রাজেশ দেঘরিয়া

বাংলা বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ

সুস্থ সমাজ ব্যস্ত করে
চলছে হাজার গাড়ি,
বড় বড় বন কাটনি করে
উঠছে দালান বাড়ি।
কারখানা আর দূষিত ধোঁয়ায়
ভরে উঠে চারিদিক,
বন্য পশুরা আশ্রয় খোঁজে
চেয়ে যায় শুধু ভিখ।
অশ্রু ঝরায় গাছের জন্য
বন্য পশুর দল,
হিংস্র মানব বুঝবে নাকি
গাছেদের সে কদর।
আজ করোনা দেখিয়ে দিল
অক্সিজেনের অভাব,
তাও পৃথিবী কাটবে যে গাছ
এইতো মানব স্বভাব।।

Night

Sukla Rana, 2nd Yr.

Night is not about only setting of a day.
It means, returning of birds to their children
and exhusted human being to their happy home.

Night is time of peace and calmness and
time to full asleep with all new dreams,
for stressless and successful tomorrow.

Night is the dark be out with stars and
Moon with rise and full of musical wind.
And it's a pleasant voyage one day to another day.

"দাও ফিরে সে অরণ্য
লও এ নগর" – রবীন্দ্রনাথ

❒ প্রবন্ধ

চার্বাক দর্শনের আলোকে দেহাত্মবাদ বা ভূতচৈতন্যবাদ

বিজন কুম্ভকার

দর্শন বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার

চার্বাক দর্শন হলো ভারতীয় দর্শনে উল্লিখিত নাস্তিক সম্প্রদায় এর অন্তর্গত একটি চরমপন্থী নাস্তিকবাদী দর্শন।'চার্বাক' নামটির অর্থ হল 'চারুবাক', যার অর্থ হলো শ্রুতিমধুর কথা। এই দর্শনের কথা হল কামের (ইন্দ্রিয় সুখ) চরিতার্থই হল মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য বা পরম পুরুষার্থ। সাধারণ লোকের কাছে এসব কথা শ্রুতিমধুর বা চারুবাক বলে এই দর্শনের নাম চার্বাক রাখা হয়েছে। অনেকে আবার মনে করেন 'চর্ব' ধাতু থেকে চার্বাক নামের উৎপত্তি হয়েছে। 'চর্ব' ধাতুর অর্থ হল 'খাওয়া-দাওয়া করা বা চর্বণ করা।'এই দর্শন খাওয়া-দাওয়াকেই জীবনের চরম লক্ষ্য মনে করেন। তাই এদের নীতিবাক্যটি হলো-'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।' চার্বাক দর্শনের মূল গ্রন্থ এখনো পাওয়া যায়নি বলে চার্বাক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কে এসম্পর্কে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। চার্বাক দর্শনের উৎস যাই হোক না কেন, এ হলো সাধারণ লোকের বা জনসাধারণের দর্শন। সাধারণ লোক প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানকেই সর্বাধিক মূল্য দেন, দৈহিক সুখকে তারা জীবনের পরম লক্ষ্য বলে মনে করেন। তাই এ দর্শন সাধারণ লোকের চিন্তাভাবনা গুলিকে তাদের দর্শনে তুলে ধরে এবং দর্শনটি সাধারণ লোকের কাছে বেশী প্রিয় বলে একে লোকায়ত দর্শন নামকরণ করা হয়েছে। চার্বাকগন দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন না। চার্বাক মতে চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই আত্মা। আত্মা সম্পর্কে চার্বাকদের এই মতবাদ আধ্যাত্মবাদী মতবাদের বিরোধী। অধ্যাত্মবাদী দের মতে দেহ ও আত্মা এক নয়। দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব আছে। দেহ জড়, আত্মা অজড়। চৈতন্য দেহের গুণ নয়, আত্মার গুণ। তাই চার্বাকগণ আত্মা সম্পর্কে এই প্রকার চিরাচরিত ধারণায় বিশ্বাসী নন।

দেহাতিরিক্ত আত্মা না মানলেও চার্বাকরা আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। চার্বাক মতে, 'চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ এব আত্মা।' চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ ছাড়া আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব চার্বাকরা মানেন না, কেননা তা প্রত্যক্ষগোচর নয়। প্রত্যক্ষবাদী চার্বাকরা বহ জগতের মূল উপাদানগুলিকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলি হল- ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ। ব্যোম বা আকাশ কে প্রত্যক্ষ করা যায় না বলে একে জগতের মূল উপাদানের মধ্যে তারা ধরেন না। সজীব দেহই আত্মা এবং চৈতন্য দেহেরই গুণ। চার্বাক বলেন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা জগতকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। এই জড়জগৎ ক্ষিতি (মাটি) অপ (জল) তেজ (অগ্নি)এবং মরুৎ (বায়ু) এই চারটি উপাদান নিয়ে গঠিত। এই চারটি উপাদানের বিশেষ সংমিশ্রনের ফলে যে দেহ গঠিত হয়েছে তাতে চৈতন্যরূপ এক নতুন গুণ আবির্ভূত হয়েছে। যদিও চতুর্ভুজের কোনোটিতেই চৈতন্য নেই, চতুর্ভুজের বিশেষ বিন্যাস বা সংমিশ্রণের ফলে যে দেহ গঠিত হয় তাতে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়।

''অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্যনলানিলা
চতুর্ভ্যঃ খলুর্ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে।।''

এর উত্তরে চার্বাকগন বলেন, উক্ত চারিভুতের কোনটিতেই চেতনা না থাকলেও চারিভুতের নির্দিষ্ট পরিমাণ সংমিশ্রণের ফলে এই গুণটি তৈরি হতে পারে। যেমন- পান, সুপারি ও চুন এই তিনটে বস্তুর ভেতর কোনটির মধ্যে লাল রং নেই। তবুও এই তিনটি বস্তু কে একসাথে চর্বণ করলে সেই মিশ্রিত পদার্থে একটা লাল আভা দেখা যায়। তাঁহারা বলেন, দেহ ছাড়া চেতনা রূপ-গুণের ভিন্ন সত্তা নেই বললেই চলে। চৈতন্য দেহ থেকেই

জাত দেহকে কেন্দ্র করেই চৈতন্যের জন্ম। দেহ বিনষ্ট হলে চৈতন্যও বিলুপ্ত হয় এবং চতুর্ভূত থেকে উৎপন্ন দেহ চতুর্ভূতেই পরিণত হয়। দেহ ভস্মীভূত হলে আর
কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। দেহাতিরিক্ত আত্মা নেই।'চৈতন্যবিশিষ্ট কায়ঃ পুরুষঃ (আত্মা)।' আত্মা সম্পর্কে চার্বাকদের এ মতবাদ ''দেহাত্মবাদ" বা 'ভূতচৈতন্যবাদ' নামে পরিচিত।

চার্বাকদের মতে আত্মা অমর তার প্রশ্ন অবান্তর। মানুষের বর্তমান জীবনই একমাত্র জীবন। পরজন্ম বলে কোন কিছু চার্বাকগণ বিশ্বাস করেন না। কারণ পরজন্মের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং মৃত্যুর পরও মানুষকে তার কুকর্মের জন্য দুঃখ ভোগ এবং সুকর্মের জন্য মানুষ সুখভোগ করবে- এই সকল কথা তাদের মতে অর্থহীন।
''পরলোকিনোহভাব পরলোকাভাব:।"

ভগবানের কাহিনী পৌরাণিক গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং পরজন্মে সুখভোগের জন্য ঈশ্বরকে তুষ্ট করার জন্য তাঁর পূজা-অর্চনা করা বোকামি মাত্র। তাঁরা বলেন, ধূর্ত পুরোহিতদের বিশ্বাস করা মানুষের উচিত নয়, কারণ পুরোহিতগণ নিজেদের জীবিকা অর্জনের জন্য ঈশ্বরের পূজা করার জন্য মানুষকে প্রলুব্ধ ও প্ররোচিত করে। মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধকৃত্যাদির কোনো ফলই নেই, ইহা শুধু ব্রাহ্মণদের রোজগারের পথ।
''ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেতকার্যাণি নত্বন্যদ্বিদ্যতে ক্বচিৎ।।"
চার্বাকরা আরো বলেছেন, ভণ্ড, ধূর্ত, নিশাচর তারাই বেদের কর্তা
"ত্রয়োবেদস্য কর্তারো ভণ্ড ধূর্ত নিশাচরাঃ।"
বেদও ধূর্ত প্রতারক পুরোহিতদের সৃষ্টি। সুতরাং চার্বাকদের মতে বেদকে বিশ্বাস করা মানুষের উচিত নয়। জড়বাদী চার্বাকদের মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ এবং যাহা প্রত্যক্ষ নয় তাহার অস্তিত্ব নেই। যেহেতু ঈশ্বর প্রত্যক্ষ গোচর নয়, সেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। তারা আরো বলেন, ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চার ধরনের জড় উপাদান এর স্বাভাবিক পরিণতি হলো জগৎ অর্থাৎ চতুর্ভূতের স্বাভাবিক মিশ্রণের ফলেই জগতের সৃষ্টি হয়েছে। তাই জগৎ স্রষ্টারূপী ঈশ্বরে অনুমান করার কোন প্রয়োজন নেই। ভারতীয় দার্শনিক গণের মধ্যে অনেকেই আত্মার মুক্তি বা মোক্ষলাভ কে মানব জীবনের পরম কল্যাণ তথা চরম লক্ষ্য বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু চার্বাকগণ বলেন আত্মার যেখানে কোন সত্তা নেই, সেখানে আত্মার মুক্তির প্রশ্ন অবান্তর মাত্র। তাদের মতে ইন্দ্রিয় সুখই মানুষের পরম কল্যাণ। তাই এই ইন্দ্রিয় সুখই তাদের জীবনের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। চার্বাকগণরা বলেন অতীত চলে গেছে, ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত, কেবল বর্তমান মানুষের আয়ত্বে আছে। সুতরাং বর্তমান জীবনে মানুষ যে উপায়েই হোক, যত বেশি উপার্জন করতে সক্ষম কিন্তু তা যদি দুঃখমিশ্রিত বলে বা অন্য কোনো কারণে বর্তমান সুখকে বিসর্জন দেয় তাহলে সেটি মানুষের পক্ষে মূর্খতা বলে গণ্য হয়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দর্শন হিসেবে চার্বাকগণ-এর মতের বিশেষ কোনো মূল্য নেই এবং এই মত সর্বাংশে নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই মত একেবারে মূল্যহীনও নয় আবার নিন্দনীয়ও নয়। চার্বাক দর্শন কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও অর্থহীন প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।এই দর্শন সাধারণ মানুষকে আত্ম-নির্ভরতার পথ দেখিয়েছে। স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণদের ষড়যন্ত্রকে চার্বাক দর্শন কঠোর আঘাত করেছে। তাই এখানেই চার্বাক দর্শনের সার্থকতা প্রকাশ পেয়েছে।

❐ প্রবন্ধ

ঘূর্ণিঝড় ফণী

মানস বাগ, দ্বিতীয় বর্ষ

অত্যন্ত তীব্র ঘূর্ণিঝড় ফণী ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যে আঘাত হানা একটি শক্তিশালী গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়।

নামকরণ ঃ- ফনি নামকরণটি করেন বাংলাদেশ। এর অর্থ সাপ। ফনি ২০১৯ সালের উত্তর ভারত মহাসাগরের মৌসুমের দ্বিতীয় নামাঙ্কিত এবং প্রথম অত্যন্ত তীব্র ঘূর্ণিঝড়। এটি ২৬ শে এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় মহাসাগরে সুমাত্রার পশ্চিমে গঠিত একটি ক্রান্তীয় নিম্নচাপ থেকে সৃষ্টি হয়। ২রা মে এরপর ফনি দুর্বল হয়ে ক্রান্তীয় ঝড় হিসেবে কলকাতার ওপারে বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যায়।

ঘূর্ণিঝড় গঠন ঃ-২৬শেএপ্রিল ২০১৯
বিলুপ্তি ঃ-৫ই মে ২০১৯
সর্বোচ্চ গতি ঃ- ২১৫ কিমি/ ঘন্টা
সর্বনিম্ন চাপ ঃ -৯৩২ hpa, ২৭.৫২ in Hg
ক্ষয়ক্ষতি ঃ -$১.৮১ বিলিয়ন
প্রভাবিত অঞ্চল ঃ - নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলঙ্কা, পূর্ব ভারত, বাংলাদেশ ও ভুটান।

আবহাওয়া ঃ- ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ ২৬ শে এপ্রিল সুমাত্রার পশ্চিমে একটি গ্রীষ্মমন্ডলীয় নিম্নচাপ পর্যবেক্ষণ শুরু করে এবং একে চিহ্নিত করে।

প্রস্তুতি ঃ- ভারতীয় নৌ-বাহিনী ঘূর্ণিঝড় ফণীর প্রভাবের প্রস্তুতির জন্য বিশাখাপত্তনম্ ও উড়িষ্যা উপকূলের নৌবাহিনীর জাহাজ নিয়োজিত করে। ঘূর্ণিঝড় তীব্রতর হতে শুরু করলে আইএমডি ভারতের দক্ষিণ পূর্ব অংশে একটি ঘূর্ণিঝড় সর্তকতা জারি করে। ঘূর্ণিঝড় ফনিকে লক্ষ্য রেখে ভারতের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী এলাকায় এসে পৌঁছায়।

প্রভাব ঃ- ঘূর্ণিঝড় ফণীর প্রভাবে প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়া বয়ে যায়। একই সঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাত হয়, ঘন্টায় ১৫০ থেকে ১৭৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যায়। উপকূলবর্তী এলাকায় ১০ লাখের বেশি মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেয়।

ক্ষয়ক্ষতি ঃ- ফণীর প্রভাবে উড়িষ্যা রাজ্যের ৩৩ জন মানুষের মৃত্যু হয়, এছাড়া প্রাদেশিক রাজধানী ভুবনেশ্বর এবং তীর্থ নগরী পুরীর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়।

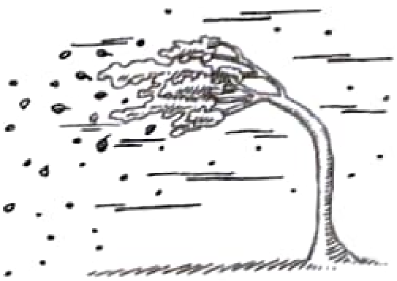

❑ প্রবন্ধ

পর্যটনে বাঁকুড়ার কোড়ো পাহাড়

আনন্দ বাঙাল, দ্বিতীয় বর্ষ

বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকে অবস্থিত পাহাড় (Koro hill) একটি স্থানীয় পর্যটন কেন্দ্র। কোড় পাহাড় সড়কপথে বাঁকুড়া শহর থেকে মাত্র ২১কিমি (বাঁকুড়া রানীগঞ্জ সড়কপথ) এবং অমরকানন থেকে মাত্র তিন কিমি দূরে অবস্থিত। কোড় পাহাড়ের উচ্চতা খুব বেশি নয়। বাঁকুড়ার বিহারীনাথ, শুশুনিয়া প্রভৃতি বিখ্যাত পাহাড়ের উচ্চতা কাছে কোড়ো পাহাড় নিতান্তই কিশোর। স্থানীয় ভূ-প্রকৃতি থেকে কোড়ো পাহাড়ের উচ্চতা ৪০০ ফুট (১২১মিটার)। বড় বড় পাথরের চাঁই আর সবুজ গাছ-গাছালিতে মোড়া যে কোন প্রকৃতিপ্রেমীর নিকট আকর্ষণীয়। পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত পাহাড়ের পাদদেশে অদূরেই রয়েছে কাপিস্টা গ্রাম। কোয়ার্টজাইট পাথরে তৈরি কোড়ো পাহাড়ে ওঠার জন্য সিমেন্টের সিড়ির সুব্যবস্থা রয়েছে। বর্ষাকাল ব্যতীত যে কোন সময় কোড়ো পাহাড় ভ্রমণের জন্য আদর্শ। কোড়ো পাহাড়ের উপর থেকে চারিপাশের প্রকৃতির রূপ বড়ই সুন্দর। চারিদিকে সবুজ গাছপালা, কৃষি-ভূমি আর দক্ষিনে স্বল্প দূরত্বে বয়ে চলেছে শালী নদী। কোড়ো পাহাড়ের উপর রয়েছে শ্রীশ্রী অষ্টভূজা পার্বতী দেবীর মন্দির। সিংহবাহিনী এই পার্বতী দেবী মন্দির টি ১৩৪৬বঙ্গাব্দে স্থাপিত হয়। পার্বতী দেবীর মন্দির এর পিছনে বৃক্ষ তলে স্বয়ং শিব ঠাকুর রয়েছেন। কিভাবে তৈরি হলো এই মন্দির? মন্দির এর সাথে জড়িয়ে রয়েছে এক দীর্ঘ ইতিহাস। প্রায় ১০০বছর আগে হিমালয় মুখী এক সাধু কাপিস্টা গ্রামে বিশ্রাম নিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি ধ্যানযোগে জানতে পারেন কোড়ো পাহাড়ে মাতৃশক্তি ও শিবশক্তির যুগপৎ অধিষ্ঠান। সেই সাধু (সাধুর নাম স্বামী বীরানন্দ) এসেছিলেন হুগলী জেলার ডুমুরদহ থেকে। এরপর কাপিস্টা গ্রামবাসীরা ডুমুরদহে লোক পাঠান, সেখান থেকে স্বামী মহিমানন্দ ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দ পাহাড়ে এসে কুঠীর তৈরি করে বসবাস করতে শুরু করেন। পরে তারা এবং ডুমুরদহের স্বামী ধ্রুবানন্দ একই রাতে পার্বতী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। এরপর মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় শুরু হয়। সেখানে প্রতিবছর সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত্য বৈষ্ণব মতে পার্বতী দেবীর আড়ম্বরহীন পুজো হয়। পাহাড়ের পাদদেশে রয়েছে তপোবন উত্তমাশ্রম, যা ১৩২৯বঙ্গাব্দে স্বামী মহিমানন্দ স্থাপন করেন। নানান ফুলের শোভায় বর্ণময় এবং শান্ত পরিবেশের এই সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন আশ্রমটিতে সময় কাটাতে সবার ভালো লাগবে। কোড়ো পাহাড় ভ্রমণের সাথে সাথে অনেক ইতিহাস জড়িয়ে আছে। এই পাহাড়ে ভিড় নয়, নিস্তব্ধতায় ও নির্জনতায় প্রকৃতি। সূর্যাস্তে পাখিদের কলতান, ঝিঁঝি পোকার ডাক এবং পাহাড়ে অধিষ্ঠাত্রী মা পার্বতীর মন্দিরের সান্নিধ্যে কোড়ো পাহাড়ের ভ্রমণ যেন এক অন্য অনুভূতি।

প্রবন্ধ

ডোকরা শিল্প

পিকু মহন্ত

দ্বিতীয় বর্ষ

ডোকরা এক ধরনের কুটির শিল্প। এই কর্ম আজকের নয় আনুমানিক চারহাজার বছর আগে এই শিল্পের প্রথম প্রচলন হয়েছিল সিন্ধু সভ্যতার মহেঞ্জোদারোতে। সেটি ছিল জার্নির গাল নারীর একটি মূর্তি আর এটিই ছিল এই শিল্পের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন। এরপর দৈনন্দিন জীবনে আর্থিক অভাব মেটানোর জন্য দরিদ্র মানুষজন এই কর্মকে শিল্পরূপে বেছে নিয়েছিল। ভারত ছাড়াও চীন, মালয়েশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। মনে করা হয় ভারতের মধ্যে মধ্যপ্রদেশের বাস্তার ও ছত্রিশগড়ে এই শিল্পের উদ্ভব হয়। এবং পরে আবার ঝাড়খন্ড ও বিহারে ছড়িয়ে পড়ে। এর আরো পরে পশ্চিমবঙ্গে ও উড়িষ্যা রাজ্যে এই শিল্পের প্রসার ঘটে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল তথা বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াতে এর সর্বাধিক বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিকনা, লক্ষীসাগর, বর্ধমান জেলার গুসকরার দরিয়াপুর ও পুরুলিয়ার নডিহা এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। তারই মধ্যে বাঁকুড়ার বিকনা ও বর্ধমানের দরিয়াপুর উল্লেখযোগ্য। উক্ত দুই জায়গার ডোকরা শিল্প প্রসিদ্ধ ও জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। বাঁকুড়া জেলার বিকনা গ্রাম এর ডোকরা শিল্প দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতেও খ্যাতি অর্জন করেছে। এই অঞ্চলের স্বল্পশিক্ষিত খেটে খাওয়া মানুষদের মধ্যে এই শিল্পের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। এই শিল্পকর্মে বাড়ীর মহিলাদের অংশগ্রহণ অধিক ভাবে লক্ষ্য করা যায়, ফলে মধ্যবিত্ত দরিদ্র পরিবারগুলি আর্থিক সচ্ছলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। শিল্প পদ্ধতি একটি জটিল ও সময় সাপেক্ষ সূক্ষ্ম শিল্প কর্ম। প্রথমে শিল্পীরা পুকুর থেকে লালবাগ সাদা মাটি সংগ্রহ করে ও মাটির মন্ড তৈরি করে,তারপর মাটি দিয়ে হাতে করে একটি অবয়ব তৈরি করা হয়, তারপর অবয়বটির উপর মোমের প্রলেপ দেওয়া হয়। শেষে নরম মাটির প্রলেপ দেয়া হয়।তারপর একে আগুনে পোড়াতে হয় ফলে মন্ডটিতে একটি ছিদ্র বরাবর বাইরে বেরিয়ে আসে। এরপর ওই ছিদ্র দিয়ে গলানো পিতল ঢালা হয় এবং শক্ত হলে মধু সংগ্রহ করা হয় এরপর সিরিষ কাগজ দ্বারা উজ্জ্বল করে বাজার জাতকরণ করা হয়। শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্য গুলি হল হাতি, ঘোড়া, বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, বিভিন্ন জিনিসপত্র, অলংকার প্রভৃতি। এই শিল্পকর্মের উৎপাদিত দ্রব্য দেশ-বিদেশের বাজারে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। এই শিল্পের জন্য ১৯৬৬ সালে শম্ভু কর্মকার, ১৯৬৮সালে দরিয়াপুরের হারাধন কর্মকার,১৯৮৮সালে মটর কর্মকার,২০১২সালে পাত্রসায়ের নিতাই কর্মকার রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে পুরস্কৃত হন। বর্তমান সময়ে ডোকরা শিল্পের উপর এক কালো ছায়া পড়তে শুরু করেছে। কেননা এই শিল্পে নানা রকম জটিল সমস্যায় পড়ে ক্ষতি হচ্ছে। যেমন কাঁচামালের অভাব ও তার অধিক মূল্য শিল্পীদের পারিশ্রমিক, কম বাজার বিকল্প, দ্রব্যের আমদানি প্রভৃতি এই শিল্পের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া বর্তমানে মহামারী পরিস্থিতিও এই শিল্পের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যদিও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডোকরা শিল্প প্রচারের জন্য কাজ করছে এবং তাদের শিল্পের প্রসারের জন্য ভাতা প্রদান সহ বিভিন্ন সংস্থা গড়ে তুলেছেন। এইসব সংস্থাগুলি শিল্পীদের শিল্প বিষয়ক নতুন শিক্ষাদান এবং তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাতকরণে বিশেষ সাহায্য করে চলেছে। অতএব অবশেষে বলা যায় সকলের সহযোগিতাই হয়ে উঠবে শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার প্রধান অস্ত্র।

❒ গল্প

ডার্ক ওয়েব

কৌশিক সিংহ

সি.আই.ডি. অফিসার সিদ্ধার্থ বাবু। এখন পর্যন্ত অনেকগুলো খুনের পর্দা ফাঁস করেছেন। সে ভাবে বেগ পেতে হয়নি। কোনো না কোন ক্লু একটা পেয়েছেন প্রতিবার। এইবারের হলেও তার অন্যথা হয়নি, কিন্তু সেই ক্লু টাকে তিনি কিছুতেই কাজে লাগাতে পারছেন না। খুন হয়েছে একটি১৫বছরের কিশোরী মেয়ে একদম বীভৎসভাবে। শরীরে কোনো পোশাক ছিলনা, সারাগা ব্লেড দিয়ে চেরা। হাত-পা বাঁধা ছিল, মুখে কাপড় গোঁজা। সবথেকে যন্ত্রণাদায়ক যেটা, সেটা হল কিশোরীর যৌনাঙ্গে কাচের বোতল ঢুকিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। তার ফলস্বরূপ যা হওয়ার তাই হয়েছে। সিদ্ধার্থ বাবুর মত একজন কঠিন সি.আই.ডি অফিসারের পর্যন্ত সেই দৃশ্য দেখে চোখ থেকে জল গড়িয়ে এসেছিল। তিনি সেই ছবিগুলি অফিসে বসে আরো একবার খতিয়ে দেখছেন। একটা ফুলের মতো নিস্পাপ কিশোরীর মেয়ের মৃত্যুর সময় ঠিক কতটা যন্ত্রনা পেয়েছিল। কথাটা চিন্তা করে তার মাথায় কিছু কাজ করছে না। খুনিকে ধরতেই হবে, সে যেমন করেই হোক। অথচ তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবার মতো কোনো পোক্ত সবুত(প্রমাণ) তার কাছে নেই। মৃত্যুর আগে কিশোরীটি শুধু রক্তাক্ত আঙ্গুল দিয়ে পাঁচটি ইংরাজী সংখ্যা লিখে দিয়ে গেছে 72221 ।এরপর আরোও কিছু লিখতে চেয়েছিল নাকি এইটুকুতেই কিছু লিখে গেছে, ঠিক ভাবে বোঝা যাচ্ছে না। কখনো মনে হচ্ছে একটা ফোন নম্বর লিখতে চাইছিল, যেটা শেষ করতে পারেনি ওর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সকলের ফোন নম্বর চেক করেও এই নাম্বারের কোন হদিস পাওয়া যায়নি। এদিকে সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে প্রতিবাদের ঢেউ উঠে গেছে, মোড়ে মোড়ে স্লোগান আর মোমবাতি মিছিলের চাপ। আর দুই এক দিনে কিছুনা করতে পারলে কেসটা সি.বি.আই হাতে চলে যাবে। সোজা কথা হলো আজ পর্যন্ত চাকরি জীবনে সিদ্ধার্থ বাবর এটাই প্রথম কেস, যেটাই তিনি পরাজিত হতে চলেছেন। আর সেটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। এক্ষেত্রে পরাজয়টা বড় কথা নয়। আসল কথা হলো, তিনি নিজে হত্যাকারিকে ধরতে চান। তা না হলে প্রতিশোধের আগুনে তিনি নিজেই পুড়ে শেষ হয়ে যাবেন। কিশোরীর মুখটা তার ঘুমের মধ্যে ভেসে উঠতেই তার ঘুম ভেঙে গেল এবং এক অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। এখন মাঝরাত, ঘড়ির কাঁটায় ১২:২০। তিনি একটা স্টেপপ্যাড ও প্যাড নিয়ে বসলেন। 72221 ইংরেজি বর্ণমালা ধরলে GBBBA শব্দ হয় কোন মানে দাঁড়ালো না। যোগ করলে, 14 অর্থ হলো AD, মানে দাঁড়ালো না। তাহলে হবেটা কী? মেয়েটা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে এমনি এমনি এটা লিখে যায়নি, কিছুতো একটা ইঙ্গিত করে গেছে।

সিদ্ধার্থবাবুর স্ত্রী বাপের বাড়িতে, হঠাৎ তার মেসেজ এলো, এবার শুয়ে পড়ো, GN8 । এবার সিদ্ধার্থ বাবুর ঠোঁটের কোনে একটা হাসি খেলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাইক নিয়ে থানায় গেলেন। সিদ্ধার্থবাবু এবার সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে চেয়ার থেকে উঠলেন তার সামনে দুজন বালক সেই কিশোরীর দুই বন্ধু বয়স সতেরো বা আঠারো। হঠাৎ করে বললেন তিনি, খুন এটা কেন করলি? ছেলেদুটোর একজন বলল খুনটা আমি করেছি ও শুধু লাইভ ক্যামেরা অন করেছিল। তাদের একজন বলতে শুরু করল এক মাস আগে আমার ফোনে একটা গেমের লিংক আসে। ক্লিক করতেই চালু হল। আমার টাকার দরকার ছিল, ড্রাফের স্টক শেষ, বাড়ির থেকেও টাকা দিচ্ছিল না। এই গেমটা টাকার সন্ধান দিল। প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল হাত কেটে নাম লেখার। করলাম আবার পেলাম ও এইভাবে প্রতি ধাপে ৪০০করে বাড়তে বাড়তে পাঁচ হাজার ডলারের চ্যালেঞ্জ এল। শর্ত এল একটি কিশোরীর

সারা শরীর ব্লেড দিয়ে চিরতে হবে এবং পরের ধাপে যৌনাঙ্গে বোতল ভেঙে ঢুকাতে হবে এবং লাইভ করতে হবে গেমে। গেম আর ডলারের নেশায় আমি তখন পাগল। সাথে নিলাম এই বন্ধুকে কিছু টাকার লোভ দেখিয়ে। সুনিতা আমাদের ক্লোজ ফ্রেন্ড তাই এক ডাকেই এল। গেম শুরু করলাম, প্রথমে কষ্ট লাগলেও ড্রাগের নেশায় অনুভব হয়নি। খুনের শেষেই ধাপে ধাপে টাকাটা ঢুকে যায়। পিছন থেকে সাইবার সেলের একজন অফিসার বললেন ফোন টা চেঞ্জ হয়ে গেছে, পুরো গেমটা ডার্ক ওয়েব থেকে পরিচালিত হয়। সিদ্ধার্থ বাবুর রাগে চোখমুখ লাল। জুতোর দিয়ে নুন লঙ্কাগুঁড়ো উঠিয়ে কাটা হাতের উপর দিয়ে শক্ত চোয়াল বলে উঠলেন 72 (সেন্টু), 221(টোটন)। মৃত্যুর শেষ ক্ষণে মেয়েটি কাঁচা রক্ত দিয়ে শুধু পাঁচটা সংখ্যা দিয়ে খুনি দুজনের নাম লিখে যায়নি। তার মত অনেক সরল ও নিষ্পাপ মেয়ের জীবন বাঁচিয়ে গেছে। চল এবার তোদেরকে অন্ধকার জগতে পৌঁছে দিয়ে আসি।

❐ প্রবন্ধ

জীবনের এক কঠিন ধাপ

শ্রেয়া মাঝি

বাংলা অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ

মানুষের জীবনের সবথেকে কঠিন সময় বলে যদি কিছু থাকে, তাহলে তা হলো মানুষের বৃদ্ধকাল। সে সময় মানুষ বড় অসহায় হয়ে পড়ে এবং অবলম্বন হিসেবে এক খুটির প্রয়োজন অনুভব করে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই অভাব হয়ে পড়েছে তাই এদেশের বৃদ্ধদের কোন ঠাই নেই। আমরা মানুষ জাতি সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী হলেও আমরা বোকা, কারণ আমরা বেশি তাদেরকে ভালোবাসি তাদেরকে ভরসা করি, যারা আমাদের ভবিষ্যতে ভালোবাসার কোনো মর্যাদা দেয় না। দেয়না বিশ্বাসের দাম, রাখে না ভরসার মর্যাদা। তাই আমরা বৃদ্ধ বয়সে বড় অসহায় হয়ে পড়ি আর যে ছেলেমেয়েদের আমরা স্নেহ যত্ন দিয়ে বড় করে তুলি নিজের বুকের ভিতর, তারা বড় হয়ে আমাদের বুকে পা দিয়ে চলে যায় আর দাঁড়িয়ে পড়ে বৃদ্ধাশ্রমের দ্বারে। তাই যদি কেউ স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে বড় করার পরিণতি বৃদ্ধাশ্রম হয় তাহলে কেন এই বৃহৎ অট্টালিকা কেন এই বৃহৎ বাড়ি আমরা ভবিষ্যতের জন্য ভেবে তৈরি করি? তাই কেন হয়ে যায় আমাদের কাছে মৃত্যুপুরী? তাই মানুষ -ওঠো, জাগো, বৃদ্ধদের প্রতি অবিচার অনাচার বন্ধ করো। যদি তারা আজ তোমাদের না পালন করত তাহলে পৃথিবীর সুন্দর লোক দেখার সৌভাগ্য হয়তো তোমাদের । আমরা আমাদের দেশের ঐতিহ্য আর অসম্মান করতে পারিনা। আমাদের মাতৃ কোল কে শূন্য করে দিয়ে পুরো পৃথিবী শূন্যতায় ভরে উঠবে, দেশ হবে অভিশপ্ত। এই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্ত হতে হলে বৃদ্ধদের কে নিজেদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে, বৃদ্ধের আবর্জনাকে বোঝা ভাবলে চলবে না।

❒ প্রবন্ধ

অনলাইন ক্লাস– সুবিধা ও অসুবিধা

প্রিয়াঙ্কা দাস

ইতিহাস বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ

সারা বিশ্ব যখন করোনা অতিমারীর প্রকোপে দিশাহীন, ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। করোনা অতিমারীকে রুখতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতও ২০২০ সালের মার্চ মাস নাগাদ কঠোর লকডাউনের পন্থা অবলম্বন করে। ফলে সমগ্র যাতায়াত ব্যবস্থা স্তব্ধ হয়ে যায়। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তঃরাজ্য ও আন্তঃদেশীয় পরিবহন সবকিছু বিকল হয়ে পড়ে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা এক প্রবল সমস্যার সম্মুখীন হয়- তারা কিভাবে তাদের পড়াশোনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে? এই সমস্যার সমাধানে অনলাইন ক্লাস শিক্ষার্থীদের কাছে এক আশার আলোরূপে দেখা দেয়।দেশের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুল-কলেজ বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন এর মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। ফলস্বরূপ সমাজের বিভিন্ন স্তরের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত হয়। কারো কাছে ইহা বরদান স্বরূপ হলেও কারো কাছে তা এক সমস্যার সৃষ্টি করে।

অনলাইন ক্লাস সাধারনত স্মার্টফোন এবং তার বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ফলে একশ্রেণীর সাধারণ মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবারের শিক্ষার্থীরা লাভবান হলেও দরিদ্র শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এর লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে শিক্ষাব্যবস্থায় এক ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের যাতায়াত বন্ধ হওয়ায় একদিকে যেমন পরিবেশের উপর ভালো প্রভাব পড়েছে এবং করোনার সংক্রমণ খানিকটা হলেও প্রতিহত হয়েছে। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ ও সম্পর্ক খানিকটা হলেও ছিন্ন হয়েছে। এছাড়া স্কুলের পরিবেশে শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে মেলামেশা, খেলাধুলার মধ্য দিয়ে যে সুমধুর সম্পর্ক গড়ে তোলে অনলাইন ক্লাস সেই খামতি কিন্তু মেটাতে পারেনি।

অনলাইন ক্লাস এর মাধ্যমে ভালো ধরনের শিক্ষা সম্বন্ধীয় তথ্য পাওয়া গেলেও শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের উপর নজর রাখতে পারেনা এবং শিক্ষার্থীদের অনুশাসনকেও যথাযথ রাখা সম্ভব হয়না। অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল এডুকেশনের যে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের অর্জন করতে হয় তাও যথাযথভাবে সম্ভব হয়ে ওঠেনা।

সুতরাং, অনলাইন ক্লাসের কিছু সুবিধা থাকার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ঘাটতিও লক্ষ্য করা যায়। অনলাইন ক্লাসকে ভবিষ্যৎ শিক্ষার উপযুক্ত মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে হলে ১০০% ডিজিটাল সাক্ষরতা যেমন প্রয়োজন তেমনি সমাজের সমস্ত শ্রেনীর মানুষ যেন এর লাভ থেকে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়েও উপযুক্ত দৃষ্টি রাখতে হবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে এখনও ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়নি, সেখানে এই সুযোগ প্রদান করার পাশাপাশি অনলাইন ক্লাস সম্বন্ধিত উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবন প্রয়োজন, কিন্তু বিভিন্ন ব্যবহারিক বিষয়ের শিক্ষা প্রদানের জন্য স্কুল-কলেজেরও প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অনলাইন ক্লাস-এর পাশাপাশি অফলাইন ক্লাসও সমানভাবে প্রয়োজন।

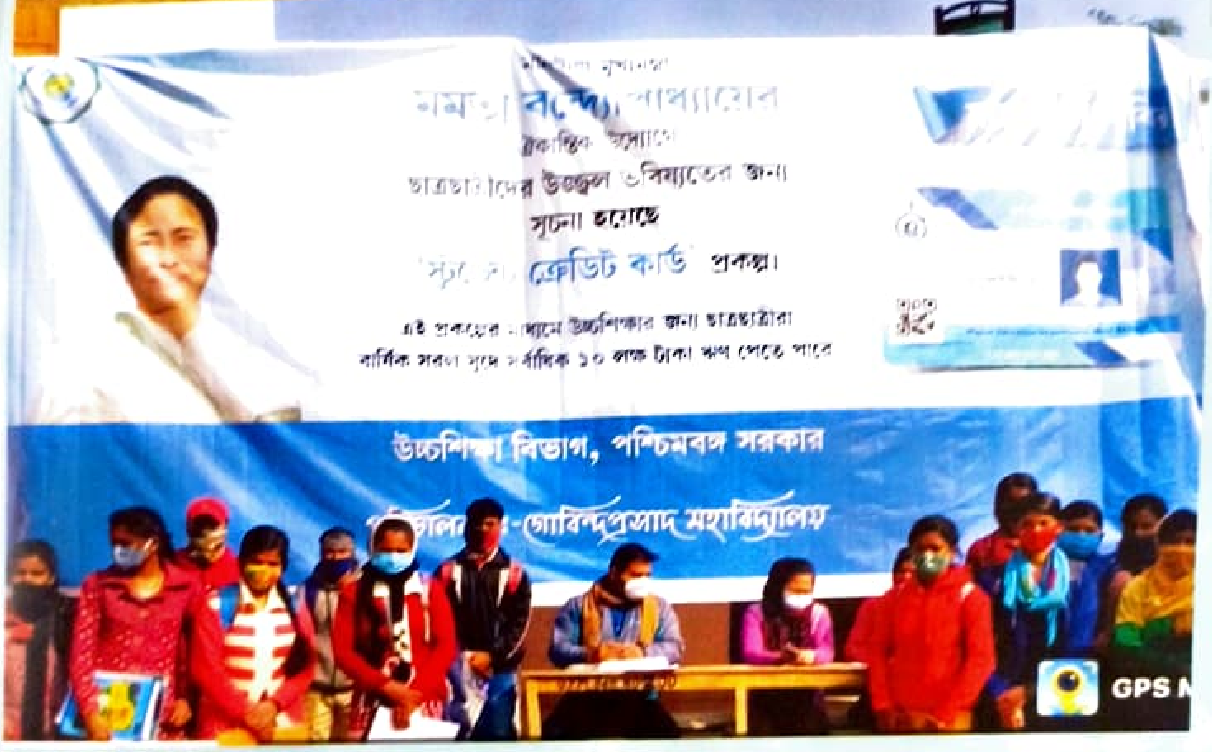
ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য
সূচনা হয়েছে
ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প।
এই প্রকল্পের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীরা
বার্ষিক সরল সুদে সর্বাধিক ১০ লক্ষ টাকা ঋণ পেতে পারে
উচ্চশিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
গোবিন্দপ্রসাদ মহাবিদ্যালয়
GPS

GOBINDA PRASAD MAHAVIDYALAYA
AWARENESS RALLY REGARDING
"COVID-19 PANDEMIC"

গোবিন্দপ্রসাদ মহাবিদ্যালয়
GPM

PRINTED AT:- SHAMAYITA PRESS, RANBAHAL, AMARKANAN, BANKURA, W.B.-722133 Mob-9475115435